৪১বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অমলেশ চৌধুরী	শ্যামল ভদ্র	২
চিকিৎসায় নৈতিকতা ও নুরেমবার্গ	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	৪
দুধ না খেলে	অরুণালোক ভট্টাচার্য	৭
কোভিড-১৯-আর্থিক সমস্যা	শৈবাল কর	১০
অস্তিত্বের সংকট	শ্যামল ভদ্র	১৩
কোভিড বর্জ্য	নন্দগোপাল পাত্র	১৭
স্বচিকিৎসা	গৌতম মিস্ত্রী	২০
অবলুপ্ত তিনটি বই	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	২৪
তারে বেতারে	অমিত চৌধুরী	২৮
চিঠিপত্র		২৯
পুস্তক সমালোচনা		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

অবশেষে অস্থির ও সঙ্কটপূর্ণ ২০২০-র অবসান হল। নতুন বছরে আশা করা যায় বিশ্বজুড়ে করোনা-অতিমারীর সঙ্কট কেটে যাবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার স্বাভাবিক পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসবে। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রসমাজ। দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তারই কিছু নমুনা তুলে ধরছি, যার সাথে উৎসমানুষ পত্রিকা কিছুটা হলেও সম্পর্কিত।

প্রিয় পাঠকবন্ধুরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন উৎস মানুষ পত্রিকার পেছনের মলাটে পুস্তক তালিকা ছাড়াও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে তার ভেতর পত্রিকার প্রাপ্তিস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেসব হকারবন্ধু বছরের পর বছর উৎস মানুষ পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছেন এই অতিমারীতে তাঁরা কেমন আছেন, কেমন চলছে তাদের ব্যবসা, না জানালে পরিস্থিতি কতটা খারাপ তা বোঝানো যাবে না। আমাদের প্রায় ৩০/৩৫ বছরের হকারবন্ধু দিলীপ মজুমদার বিবাদী বাগ অঞ্চলের ডেকার্স লেনের লাগোয়া সরু গলি ড্রেপারস লেনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে উৎস মানুষ রাখতেন। আদ্যিকালের এক বাড়ির গায়ে দিলীপের একচিলতে দোকান। বাড়িটি প্রোমোটিং হবে। দিলীপ উচ্ছেদ হলেন। উল্টোদিকের রাস্তার ওপরে কিছুদিন পত্রিকা নিয়ে বসলেন। কিন্তু এই বাজারে খদ্দের কোথায়? তা-ও কিছুদিন টেনেছিলেন। শেষে আর পাঁচজন হকারবন্ধুর মতো পেশাটাই ছেড়ে দিলেন। পত্রিকার বিক্রিবাটা কেমন হচ্ছে তার খোঁজ নেওয়া, বিক্রির টাকা চাওয়া এসবের জন্য দিলীপের সঙ্গে হয় ফোনে নয়ত সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে হত। শেষ যেবার গেলাম বলল অবস্থা শোচনীয়, আর চলছে না। কোনও সিকিউরিটি গার্ডের কাজের সন্ধান থাকলে জানাতে বললেন।

বিবাদী বাগে মূলত লিটল ম্যাগাজিন বিক্রেতা বলতে একডাকে অমর কোলেকে সবাই চেনে। টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকে এক পুরনো বাড়ির জানলার বাইরের দিকে খোপে ওই অতটুকু জায়গায় বেশ গুছিয়ে রাখা পত্রিকা ও বই। লিটল ম্যাগাজিন বেচে তো আর পেট চলে না। অমর বাছাই করা বই-পত্রও রাখেন। লকডাউনের সময় ট্রেন বন্ধ থাকায় বাড়িতেই ছিলেন। মাঝে মধ্যে ১০০ দিনের কাজ পেল তো দু-পয়সা হাতে এল নয়ত রোজগার বন্ধ। প্রায় ৭ মাস বন্ধ থাকার পর গত নভেম্বর থেকে সপ্তাহে ৩ দিন দোকান খোলে। মাঝে মাঝেই ফোন করি। ক'দিন আগে টাকাপয়সার কথা

তুলতেই বলল, আমাকে কিছু সাহায্য করলে ভাল হয়। গোলপার্ক এলাকায় রথীনদার ৪৫ বছরের দোকান। ওখান দিয়ে গেলেই পত্রিকার বিক্রি-টিক্রি কেমন হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করাটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি একদিন সন্ধ্যেবেলা রথীনদা বললেন যে, দাদা আর যে চলে না। সারাদিনে মেরেকেটে ৫০ টাকারও বিক্রি হয় না। এই বয়সে নতুন কোনও আয়ের পথও দেখছি না। তা-ও চূড়ান্ত হতাশা নিয়ে দোকান দিচ্ছেন। সীতারাম বুক স্টল, গড়িয়া ৬ নম্বর বাস ডিপোর গা-ঘেঁষে ছোট্ট দোকান। বিগত বেশ কয়েক বছর সেখানে উৎস মানুষ রাখা হত। সম্প্রতি জানা গেল দোকান বন্ধ। সকালে খবরের কাগজ দিতেন, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ি-বাড়ি জল বিক্রি করে কোনোমতে চলছে। লিটল ম্যাগাজিন বিক্রির প্রশ্নই নেই। রাসবিহারী মোড়ে কল্যাণ ঘোষ-এর হাল রথীনদা, অমর কোলের মতো না হলেও বিক্রি এতটাই কমে গেছে যে দিশেহারা অবস্থা। হকারবন্ধুদের অবস্থা খারাপ মানে লিটল ম্যাগাজিনের অবস্থা আরও খারাপ। একে কাগজের দাম, ছাপার খরচ সব এতটাই বেড়ে গেছে যে, পত্রিকার দাম না বাড়ালে আর চালানো যাচ্ছে না, ফলে বাড়তি দামের বোঝা পাঠকের ঘাড়ে চাপছে। এতসব অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে চলতে হচ্ছে।

এসব সত্ত্বেও কিছু খবর আশা জাগায়।। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত কেরালার 'ডাক্তার একেবি সদ্ভাবনা মিশন স্কুল অব হোমিও ফার্মাসি'-র আবেদন খারিজ করে দিল। হোমিওপ্যাথিতে কোভিদ-১৯ সারে বলে যে দাবি করা হচ্ছিল কেরালার শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। যার জন্য মিশন স্কুল শীর্ষ আদালতে আবেদন করে।

অতিমারীতে এবারে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা অনিশ্চিত। বইমেলা শুধু পুস্তক-প্রেমীদের নয় প্রকাশকদেরও উজ্জীবিত করে। আমাদের মতো ছোট প্রকাশকদের অল্প হলেও কিছুটা নগদ প্রাপ্তি হয়, যা দিয়ে ছাপাখানার বকেয়া মেটানো হয়। করোনা অতিমারী তাতে জল ঢেলে দিল। অতিমারীতে নিজেদের মধ্যে ঠিকমত যোগাযোগটুকুও করা যায় নি। তবুও টিকে থাকতে হবে এই জেদ ধরেই আমরা এগোচ্ছি। — **সম্পাদকমণ্ডলী** উমা

জীববিজ্ঞানী ও সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ : অমলেশ চৌধুরী

(জুন ১১, ১৯৩১-ডিসেম্বর ৩০, ২০২০)

সুন্দরবনের সাগরদ্বীপের এস ডি মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাণপুরুষ ও আজীবন সম্পাদক অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী প্রয়াত হলেন ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। সেই সাথে করোনা-ভাইরাসের সংক্রমণ তাঁর অসাধারণ এক কর্মময় জীবনের অবসান ঘটায়। এক মহীরুহের অনাড়ম্বর প্রস্থান। বর্তমানে স্ত্রী ও এক কন্যা করোনা-ভাইরাসের সংক্রমণে অসুস্থ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দ্বিতীয় কন্যা বিদেশে।

সমুদ্র উপকূলের জীববৈচিত্র্য ও সুন্দরবন অঞ্চলে গাছপালা-প্রাণীকুলের জীবনচক্র নিয়ে গবেষণার কাজ তাঁকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। সাইক্লোন আমফান-এর পরে উৎস মানুষ পত্রিকায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যায় তাঁর লেখা ''সুন্দরবন: ভূত ও ভবিষ্যৎ'' এক অনবদ্য সংযোজন, যা বিষয়টির গভীর সংকটকে নির্দেশ করে। সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ লেখা।

অমলেশ চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু আমতা কলেজে, তারপর বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসে জীববিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীববিদ্যায় স্নাতকোত্তর এবং পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণার কাজ শুরু ভ্রূণ ও পরজীবী ব্যাকটেরিয়াদের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজে। তাঁর অন্যতম কীর্তি— ৮০-র দশকের শুরুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মেরিন সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও বিভাগীয় প্রধান। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথম থেকেই তাঁর সমুদ্রের প্রাণী ও সুন্দরবনের উদ্ভিদ-জীববৈচিত্র্যের প্রতি কৌতূহল ও তীব্র আকর্ষণ ছিল, তারই ফলশ্রুতি সাগরদ্বীপের এস ডি মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা, যেখানে আজীবন বিরাট একদল গবেষক নিয়ে কাজ চালিয়ে গেছেন। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ২০১৯শে 'পরিকথা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা — 'ভবিষ্যৎ পৃথিবী এক বিপন্ন বিস্ময়' প্রসঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরীর রচনা 'সুন্দরবন সত্যিই

তপোবন' থেকে কিছুটা অংশ উল্লেখ করা যায়— ''...প্রায় ৬০ বছর সুন্দরবনের বিশেষ বনানী আর সেখানকার বিচিত্র প্রাণী-জগৎ-এর বিষয়ে পড়া পড়া খেলা আর গবেষণার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সত্যিই ধন্য মনে করি। কল্পনায় মনে করি সেই সুন্দরবনের কথা যখন এই বনে মানুষের আগমনই হয় নি। মানে যখন এই ভূ-ভারতে মানুষের পদচিহ্নই পড়েনি তখন এই বনানীর আবির্ভাব হয়েছিল এই বঙ্গে (অবিভক্ত) আজ থেকে প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার বছর আগে — সমুদ্র (এখনকার বঙ্গোপসাগর) থেকে জন্ম নেওয়া এক বিশেষ বনানী। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যার নামকরণ করেছেন ম্যানগ্রোভ বা মাঙ্গাল নামে। এখনকার সুন্দরবনের বসবাসকারী মানুষরা এই বনানীর নামকরণ করেছেন বাদাবন হিসেবে। ...আমার মনে হয় সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন এক অমূল্য উন্মুক্ত গবেষণাগার যার কাছ থেকে আমরা অনেক পাঠ গ্রহণ করতে পারি। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সুন্দরবন সত্যিই তপোবন।"

অধ্যাপক চৌধুরী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ছিলেন, যেমন ভারত সরকারের ম্যানগ্রোভ স্টিয়ারিং কমিটি, ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যাকশন প্ল্যান ফর দি সুন্দরবন, চেয়ারম্যান— কোস্টাল ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নিউ ইয়র্ক একাডেমি অফ সায়েন্স। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ জি সি থেকে সবচেয়ে বড় গবেষণার অনুদান অধ্যাপক চৌধুরীর অধীনেই দেওয়া হয়েছিল, যা আমাদের দেশে একটি রেকর্ড। একসাথে ২৮ জন গবেষক ওই প্রজেক্টে কাজ করতে পেরেছিল, ফলত অনেক গবেষণাপত্র, রিপোর্ট ও বই প্রকাশিত হয়েছিল, যা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যে কোনও ম্যানগ্রোভ রক্ষায় ও সামুদ্রিক প্রাণীর গবেষণায় পরিকল্পনার সহায়ক। তাঁর বই 'ম্যানগ্রোভস অফ দি সুন্দরবন্স', vol-1 ১৯৯৪, লেখক এ বি চৌধুরী ও এ চৌধুরী এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিজার্ভস্ (IUCN), সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত, একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

গত বছর উৎস মানুষ পত্রিকায় লেখার জন্য অধ্যাপক চৌধুরীর সাথে যখন প্রায়ই ফোনে কথা হত, তখন তাঁর অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। বাংলাদেশের সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে বিরাট খাড়ি রয়েছে, যার গভীরতা দেড় থেকে দুই কিলোমিটার। ওনার অনুমান সেখানে এক শ্রেণীর তিমি মাছের বাস, যা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন— আক্ষেপ অনেক চেষ্টাতেও তা করে উঠতে পারেন নি। এখন বাংলাদেশ ও আমেরিকার সহযোগী সংস্থা যৌথ উদ্যোগে ওই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছে। দীঘায় কয়েক বছর আগে একটা বড় তিমির (Bryde's Whale) মৃতদেহ ভেসে আসে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওঁর পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে সেটিকে বিশেষ পদ্ধতিতে মাটি চাপা দিয়ে রাখে, পরে তিমির কঙ্কালটি জীবাণুমুক্ত করে দীঘার মেরিন অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে সংরক্ষিত করে রাখে দর্শকদের জন্য। অধ্যাপক চৌধুরী বলেছিলেন, সুন্দরবন নিয়ে উৎস মানুষের জন্য আরও বিস্তারিত লিখবেন।

ওঁর সমস্ত বিষয়ে কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। জেগে ওঠা নয়াচর দ্বীপে যখন কেমিক্যাল হাব করার প্রস্তাব হয়, তখন তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। কারণ নয়াচরে ১০ থেকে ১২ রকমের ঘাস জন্মায় যেগুলির হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গবেষণায় দেখিয়েছিলেন যে, ফারাক্কা ব্যারাজ হওয়ার পর হুগলি নদীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে অনেক রকমের মাছ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়, আবার এখন হুগলি নদীর মোহনায় জল লবণাক্ত হওয়ায় ওই সব প্রজাতির মাছ ও প্রাণীদের দেখা যাচ্ছে। জল, জঙ্গল ও পরিবেশ ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। স্বল্প পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ওনার নামের আগে কোনও ভূষণ যোগ হয়নি ঠিকই কিন্তু তিনি অনেক আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন। ২০২০ আমাদের নানানভাবে রিক্ত করেছে। অমলেশবাবুর প্রয়াণে যে শূন্যস্থান রয়ে গেল তা পূরণ হবার নয়। **শ্যামল ভদ্র**

সহায়তায় : অধ্যাপক দীপকরঞ্জন মণ্ডল — অধিকর্তা, সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়নমেন্ট (SAFE), কলকাতা।

উমা

চিকিৎসা পেশার নৈতিকতার পুনর্গঠন
নুরেমবার্গ মেডিক্যাল ট্রায়াল, নতুন করে দেখা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

লিও আলেকজান্ডার একজন নামী মানসিক রোগের চিকিৎসক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট যুদ্ধোপরাধীদের নিয়ে নাৎসি বাহিনীর সদর দপ্তর নুরেমবার্গে ১৯৪৬ সাল থেকে যে ১২টি বিচার বা ট্রায়াল শুরু হয় তার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শুধু তাই নয়, আমেরিকার 'সেক্রেটারি অব ওয়ার'-এর উপদেষ্টাও ছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মান্য 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকায় ১৪ জুলাই, ১৯৪৯-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন 'Medical Science Under Dictatorship'। আমার আলোচনা এ প্রবন্ধের কাছে ঋণী। সে লেখায় তিনি বলেন— 'A large of this research was devoted to the science of destroying and preventing life, for which I have proposed the 'ktenology', the science of killing.' অস্যার্থ, মৃত্যুর একটি বিজ্ঞান গড়ে উঠল— এমন ভয়াবহ সেদিনের সেই বিশ্ব পরিস্থিতি।

যা হোক, ১৯৪১ সালে পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানিগুলোর একটি ছিল জার্মানির আইজি ফারবেন। এখন যে ওষুধ কোম্পানিগুলোর নাম বিশ্বসুদ্ধ প্রায় সব শিক্ষিত মানুষই জানে— যেমন, বেয়ার, হেক্সট ইত্যাদি— এরকম ৬টি কোম্পানি নিয়ে তৈরি হয়েছিল বহুজাতিক আইজি ফারবেন; একইসাথে ওষুধ এবং রাসায়নিক তৈরির কারখানা। ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে যখন ধীরে ধীরে জার্মানির ভাগ্য ও ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক হিসেবে হিটলারের জন্ম হচ্ছে সে সময়ে হিটলারের নির্বাচনী প্রচারে অর্থের সবচেয়ে বৃহৎ জোগানদার ছিল এই কোম্পানি। যে বছর হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হলেন অর্থাৎ ১৯৩৩-এ আইজি ফারবেন ব্যক্তিগতভাবে হিটলারকে এবং তাঁর নাৎসি পার্টিকে ৪০০, ০০০ রাইখসমার্ক (মার্ক) অর্থ সাহায্য করে। পরের বছর ১৯৩৪-এ হিটলার ফুয়েরার হবার পরে এর পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

আউশভিৎস জার্মানির সবচেয়ে বড়, কুখ্যাত এবং আতঙ্কজনক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। আইজি ফারবেন-এর গোড়ার দিকের উদ্দেশ্য ছিল ওখানে একটি দানবাকৃতি আইজি ফারবেন কমপ্লেক্স তৈরি করা যেখানে ইউরোপ এবং বিশ্বকে অধিকার করার যে পরিকল্পনা হিটলারের রয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে সিন্থেটিক পেট্রল এবং রবারের উৎপাদন করা যাতে যুদ্ধ চলাকালীন কোনও সময়েই এ দুটির অভাব না ঘটে। এবং এ কোম্পানিটির গুরুত্ব এতটাই ছিল যে শুধুমাত্র এজন্য ১৯৪২ সালে আইজি ফারবেন-আউশভিৎস শাখাও তৈরি হয় এ হেন আইজি ফারবেনের ম্যানেজার অটো অ্যামব্রস (Otto Ambros) এবং আউশভিৎসের কমান্ডারের মধ্যে যেরকম বার্তা বিনিময় হয়েছিল তাতে যে কোনও সুস্থ মানুষের গা গুলিয়ে উঠবে। আমি সংক্ষিপ্ত চেহারায় সেই দীর্ঘ কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত করছি—''আমাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য যে নতুন ওষুধ বেরিয়েছে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যদি আপনারা কিছু সংখ্যক বন্দীর সরবরাহ দিতে পারেন আমরা সেটা বিশেষভাবে মনে রাখব।''

''আমরা আপনাদের উত্তরে ইতিবাচক অবস্থান জানাচ্ছি। কিন্তু এক-একজন মহিলা বন্দীর জন্য ২০০ মার্ক আমাদের কাছে বেশ মনে হচ্ছে। আমরা প্রস্তাব রাখছি মহিলাদের দাম ১৭০ মার্কের বেশি করা সম্ভব নয়। যদি এটা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে মহিলাদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমাদের মোটামুটি ১৫০ জন মহিলা প্রয়োজন।''

''আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হল সেটা আমরা নিশ্চিত করছি। আমাদের জন্য যতটা সম্ভব সুস্থ দেহের ১৫০ জন মহিলা তৈরি রাখুন।''

''১৫০ জন মহিলাকে আমরা পেয়েছি। তাদের ক্ষতবিক্ষত (macerated) অবস্থা সত্ত্বেও এদেরকে সন্তোষজনক বলেই মনে হচ্ছে।''

''পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করা হয়েছে। যাদের ওপরে পরীক্ষা করা হয়েছে তারা সবাই মারা গেছে। আমরা আপনাদের সঙ্গে শিগগিরই নতুন সাপ্লাই-এর জন্য যোগাযোগ করব।''

ঘুমের নতুন ওষুধ ছাড়াও আউশভিৎসের সাথে আইজি

ফারবেনের আরেকটি স্বার্থ যুক্ত ছিল। সে সময়ে কীটনাশক হিসেবে জাইক্লোন বি (Zyklon B বা Cyclone B) তথ্যে সায়ানাইডযুক্ত অতি বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগের পরীক্ষা চলছে। এটাই পরে গ্যাস চেম্বারের গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সে গ্যাসের ব্যবহারিক ক্ষমতা সম্পর্কে হাতে কলমে ফলাফল জানার জন্যও আউশভিৎসের প্রয়োজন ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন জাইক্লোন বি-র আগে ১৯৩৬ সালে 'টাবুন' নামে একটি গ্যাস (রাসায়নিক নাম— ইথাইল ডাই মিথাইলঅ্যামিডোসায়ানো ফসফেট) তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৩৮-এ আবিষ্কৃত হল 'সারিন' নামে আরেকটি বিষাক্ত নার্ভ গ্যাস (রাসায়নিক নাম— আইসোপ্রোপিল মিথেনফ্লুরোফসফোনেট)। ১৯৪৪ সালে তৈরি হয়েছিল 'সোমান' (রাসায়নিক নাম--- পিনাকোলিল মিথাইলফসফোনোফ্লুরিডেট)। ১৯৪৪ সালেই আরেকটি মারাত্মক গ্যাস ফসজিন (কার্বোনিল ডাইক্লোরাইড) ৪০ জন বন্দীর ওপরে প্রয়োগ করে দেখা হয়। অন্তত ৪ জন বন্দী ফুসফুসে জল জমে যাবার ফলে মারা যায়। এক শিউড়ে ওঠা বিবরণ পাওয়া যায়। ''বন্দীদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল ৩০ মিনিট গ্যাস চেম্বারে থাকার জন্য। ১০ মিনিট পরে ক্যাম্পের কমান্ডার দুজন বন্দীর ফুসফুস ফেটে যাওয়ার শব্দ (হাততালি দেবার মতো) শুনতে পায়। ওদের মুখ, নাক এবং কান দিয়ে গলগল করে বাদামি ফেনা বেরিয়ে আসছিল।''

১৯৪৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানির পরাজয়ের পরে মানুষের ইতিহাসে তখনও পর্যন্ত জঘন্যতম যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য নাৎসি সদর দপ্তর নুরেমবার্গ শহরেই ট্রায়াল শুরু হয়। মোট ১২টি ট্রায়াল বা বিচার হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমটিই ছিল 'নুরেমবার্গ মেডিক্যাল ট্রায়াল'। শুরু হয়েছিল ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ এবং শেষ হয়েছিল ২০ আগস্ট, ১৯৪৭।

মানুষের ওপরে যেসব অভাবনীয় পরীক্ষা চালানো হয়েছিল

এখানে যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার তা হল নাৎসি জার্মানিতে দু'ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। একটি ঘটেছিল প্রধানত সামাজিক ক্ষেত্রে — লোকচক্ষুর সামনে, আরেক ধরনের ঘটনা ঘটেছিল লোকচক্ষুর আড়ালে এবং কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে। দ্বিতীয় বিষয়টিই বেশি আলোচিত। কারণ সোভিয়েত মুক্তি ফৌজ ও আমেরিকান বাহিনী ক্যাম্পগুলোর দখল নেবার পরে বীভৎসতার প্রান্তসীমায় পৌঁছনো প্রায় সমস্ত দলিল (অনেকটাই ফ্যাসিস্ট বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে ধ্বংস করে ফেলেছিল) এবং অত্যাচার সহ্য করেও যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁদের বয়ান উদ্ধার করে। এ সমস্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ১ বছর বাদে ট্রায়াল শুরু হয়।

কি-কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল বলার আগে এক ডাক্তারের নাম আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে। ড. জোসেফ মেঙ্গেল। 'নাৎসি রেসিয়াল হাইজিন' বা জাতিগত পরিচ্ছন্নতার হিংস্রতম কার্যকলাপ এবং পরীক্ষা চালানোর জন্য এই ডাক্তারের আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং কুখ্যাতি অর্জিত হয়। কুখ্যাতি অর্জনের আরেকটি কারণ ছিল আউশভিৎস এবং বির্কেনাউ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যমজদের ওপরে ভয়ঙ্করতম পরীক্ষা চালানো। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে ইউজেনিক্স বা বিশুদ্ধ আর্য রক্তের মধ্যে প্রজননের উদ্দেশ্যে ৪০০,০০০ জার্মানকে জোর করে নির্বীজকরণ করা হয়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল ইউজেনিক্সের শুরু কিংবা নির্বীজকরণ প্রক্রিয়ার জনক কিন্তু জার্মানি নয়। ১৯০৭ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মুক্ত গণতন্ত্রের দেশ খোদ আমেরিকাতে ৪০,০০০ আমেরিকাবাসীর নির্বীজকরণ করা হয়। এদের বেশিরভাগই ছিল মানসিক রোগী এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। স্মরণে রাখতে হবে রেসিয়াল হাইজিন এবং ইউজেনিক্সের জন্ম এবং বিকাশও আমেরিকায়। পরে নাৎসি জার্মানি এটাকে রাষ্ট্রিকভাবে গ্রহণ করে।

সে সময়ের জার্মানিতে একটি স্কুলপাঠ্য বইয়ের ক্যাপশনসহ ছবি ছিল 'তুমিও এ বোঝা বহন করেছ। সতর্কবাণী হিসেবে বইয়ে লেখা ছিল— ''জন্মগতভাবে অসুস্থ একজন মানুষের জন্য ৬০ বছর বয়সসীমা অবধি এক জার্মান নাগরিককে গড়ে ৫০,০০০ রাইখসমার্ক (মার্ক) বোঝা হিসেবে বহন করতে হয়।''

'অন-আর্য' মুক্ত জার্মানি গড়ে তোলার জন্য অন্য জাতের 'অ-শুদ্ধ' রক্তের মানুষদের জন্য সম্পূর্ণ নিঃশেষিকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল (ভিন্ন প্রেক্ষিতে বর্তমান ভারতের কথা পাঠকেরা স্মরণে রাখবেন নিশ্চয়ই) তার প্রধান বলি ছিল— মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, সাইকোটিক (বিশেষ করে স্কিৎসোফ্রেনিক বা উন্মাদ), মৃগী রোগী, বার্ধক্যজনিত কারণে অশক্ত এবং বিভিন্ন স্নায়ু রোগে ভোগা মানুষেরা, পার্কিনসনিজমের রোগী, ডাউন্স সিন্ড্রোমের রোগী, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, জিপসি বা রোমা, ইহুদি এবং অনার্য যে কোনও গোত্রের মানুষ। জোসেফ মেঙ্গেল এক্ষেত্রে খুব কার্যকরী এবং দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মূলত যমজ সন্তানদের ওপরে পরীক্ষা চালাতেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার মেয়েদের বন্ধ্যাকরণের জন্য জরায়ু এবং গর্ভাশয়ে আয়োডিন, বেরিয়াম ইত্যাদির বিভিন্ন যৌগ সহ নানারকমের পরীক্ষা

চালানো হত। আউশভিৎস ক্যাম্পে একদিনে ১০০০ নারীকেও বন্ধ্যা করার ইতিহাস আছে।

সকাল ৬টায় শুরু হত যমজদের জীবন। কি কি করা হত ওদের নিয়ে? (১) জোর করে উলঙ্গ করে ফেলে কয়েক ঘণ্টা ধরে ওদের দেহের অ্যানাটমির বিভিন্ন মাপ নেওয়া হত। এ থেকে জিনগত পার্থক্য বোঝার চেষ্টা চলত। (২) এক যমজের দেহের রক্ত আরেকজনের দেহে দেওয়া হত ব্লাড গ্রুপ না মিলিয়েই। মৃত্যু হামেশা ঘটত। (৩) নীল চোখের প্রতিলিপি তৈরির জন্য চোখে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দেওয়া হত। এতে চোখের অস্বাভাবিক যন্ত্রণা, এমনকি অন্ধত্বও ঘটত। (৪) বিভিন্ন ধরনের রহস্যজনক ইনজেকশন দেওয়া হত স্পাইনাল কর্ডে। শরীরে প্রবেশ করানো হত টাইফাস এবং টিবির জীবাণু। এরপরে এদের মেরে ফেলে শবব্যচ্ছেদ করা হত— বিভিন্ন দেহযন্ত্রে কিরকম প্রভাব পড়ে দেখার জন্য। (৫) অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়াই অ্যাম্পুটেশন, কিডনি বা অন্য দেহাংশ কেটে নেওয়া, খোজা করে দেওয়ার মতো অপারেশনগুলো করা হত। (৬) কোনও কোনও যমজের হৃদপিণ্ড বাইরে থেকে ছুঁচ বিদ্ধ করা হত, ফেনল (কার্বলিক অ্যাসিড) বা ক্লোরোফর্ম ইনজেকশন দেওয়া হত হৃদপিণ্ডে। এর তৎক্ষণাৎ রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু হত। এবার ফলাফল দেখার জন্য করা হত শবব্যবচ্ছেদ। (৭) কৃত্রিমভাবে গ্যাংগ্রিন তৈরি করার জন্য হাতে পায়ে শক্ত বাঁধন দেওয়া হত। যদি যমজদের একজন মারা যেত তাহলে আরেকজনকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হত। ১৪ জোড়া যমজকে মেরেছিলেন মেঙ্গেল। সারারাত ধরে তাদের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন।

রাভেন্সব্রুক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আরেক ধরনের পরীক্ষা চলত যাকে বলা হত 'হেটেরোপ্লাস্টিক ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন'। গোটা গোটা অঙ্গ, যেমন কাঁধ বা হাত বা পা, জীবন্ত বন্দীদের দেহ থেকে কেটে নেওয়া হত এবং হোহেনলাইচেন-এর SS Hospital-এ পাঠিয়ে দেওয়া হত অন্য বন্দীর ওপরে ব্যর্থ ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য। সাধারণত অঙ্গহীন হতভাগ্য বন্দীটিকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হত।

কি নিদারুণ রসিকতা! 'চ্যারিটেবল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ফর দ্য সিক' বলে একটি কোম্পানি এই মৃত্যু গহ্বর থেকে ছিন্ন শির ড. হ্যালারভর্ডেন নামে এক নিউরো প্যাথলজিস্টের কাছে পৌঁছে দিত। ড. হ্যালারভর্ডেনের ব্যক্তিগত বয়ানে এরকম ৫০০টি ছিন্ন মস্তক পাবার কথা জানা যায়। একেকবার ১৫০ থেকে ২৫০টি করে মাথা 'চ্যারিটেবল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ফর দ্য সিক' বহন করে নিয়ে যেত। কি অসামান্য নাম-মাহাত্ম্য! মৃত মানুষের খুলি বহনের জন্য ব্যবহৃত পরিবহন সংস্থার নাম 'চ্যারিটেবল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ফর দ্য সিক'!

জীবন্ত মানুষের ওপরে চালানো বিভিন্ন পরীক্ষা

এক দুই করে বললে জীবন্ত মানুষের দেহের ওপরে কি ভয়াবহ, নৃশংস এবং বীভৎস সব পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তার একটা অনুমান করা যাবে। আমরা মনে রাখব যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন মেডিক্যাল জ্ঞানের নামে এই কল্পনাতীত ঠাণ্ডা মাথার হিংস্রতার খবর পৃথিবীর সামনে আসে তখন সমস্ত স্বাভাবিক, সভ্য মানুষ এবং চিকিৎসক মেডিক্যাল এথিক্সের একটি নতুন কাঠামো দেবার চেষ্টা করেন, যার নাম **নুরেমবার্গ কোড**। 'পারমিসিবল মেডিক্যাল এক্সপেরিমেন্টস' অংশে ১০টি পয়েন্টের এই কোডের প্রথম পয়েন্ট বা বাক্যটি হচ্ছে— ''কোনও মানুষের সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় অনুমতি দান চূড়ান্তভাবে জরুরি।'' আজ যাকে আমরা 'ইনফর্মড কনসেন্ট' বলি তার সূচনাবিন্দু এই নুরেমবার্গ কোড। প্রাক-নুরেমবার্গ এবং নুরেমবার্গ-উত্তর মেডিক্যাল এথিক্সের ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটে গেল।

মানুষের শরীরে যেসব পরীক্ষাগুলো চালানো হয়েছিল সেগুলো একবার দেখে নিই।

(১) অতি-উচ্চতার পরীক্ষা — ৬০,০০০ ফুট থেকে হঠাৎ করে ৪০,০০০ হাজার ফুটে নেমে এলে জার্মান বৈমানিকদের শরীরে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে এটা বোঝার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এই হতভাগ্য বন্দীদের। এদেরকে অত্যন্ত কম বায়ুচাপের চেম্বারের মধ্যে ঢোকানো হত দেহের ওপরে কম বায়ুচাপের ফলাফল বোঝার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতভাগ্য বন্দীর মৃত্যু ঘটত।

(২) দাহ্য বস্তু এবং বোমার পরীক্ষা — বন্দীদের দেহে প্রথমে অতিদাহ্য ফসফোরাস জ্বালিয়ে ক্ষত তৈরি করা হত। এরপরে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে দেখা হত কি প্রভাব পড়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই অধিকাংশ বন্দী মারা যেত।

(৩) অতি কম তাপমাত্রার পরীক্ষা — এ পরীক্ষাগুলোর আরেকটা নাম ছিল 'হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্ট'। জার্মান বৈমানিকেরা বিমান ভেঙ্গে বরফ ঠাণ্ডা জলে পড়লে কি হতে পারে সেটা বোঝার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্দীদের উলঙ্গ করে সজ্ঞানে হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রার জলে ফেলে দেওয়া হত। কখনও কখনও এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত জলে চুবিয়ে

রেখে শরীরে এর প্রভাব মাপা হত। পরবর্তী সময়ে এই পরীক্ষাগুলোর বৈজ্ঞানিক অসারতা প্রমাণ করার জন্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল-এর মতো পত্রিকায় 'নাৎসি সায়ান্স— দ্য ডাচাউ হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্ট' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল — এতটাই ছিল এসব এক্সপেরিমেন্টের প্রভাব।

(৪) সমুদ্রের জলের পরীক্ষা — বন্দীদের পানীয় সমস্ত জল বন্ধ করে দিয়ে কেবল সমুদ্রের জল খেতে দিত, এমনকি বন্দীদের দেহে রক্তনালী দিয়ে সমুদ্রের জলও ইঞ্জেকশন করে মাপা হত সহন ক্ষমতার মাত্রা। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে বেশিরভাগ বন্দীর মৃত্যু ঘটত।

(৫) ম্যালেরিয়া ও টিবির পরীক্ষা — ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কি ওষুধ ব্যবহার করা যায় এজন্য বন্দীদের দেহে ম্যালেরিয়া এবং টিবির জীবাণু বারবার প্রবেশ করানো হত। প্রসঙ্গত, বন্দীদের রক্তে ফেনল (কার্বলিক অ্যাসিড) এবং গ্যাসোলিন ইঞ্জেকশন দেবার অনেক প্রমাণ আছে। পরিণাম? মৃত্যু।

(৬) সালফানিলামাইডের পরীক্ষা — সে সময়ে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হলেও মূলত সালফার যৌগের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার প্রধান ছিল। এজন্য হাতে-পায়ে কৃত্রিমভাবে ক্ষত এবং ইনফেকশন তৈরি করা হত। কিভাবে? স্ট্রেপ্টোকক্কাস, গ্যাস গ্যাংগ্রিন এবং টিটেনাসের ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে প্রথমে সংক্রামিত করা হত। সেই ক্ষতে কাঠের টুকরো গুঁজে, কাঁচের টুকরো ঢুকিয়ে বীভৎস অবস্থা সৃষ্টি করা হত। এবার ওষুধ দিয়ে দেখা হত কি ফলাফল হয়।

(৭) স্পটেড ফিভার বা টাইফাস নিয়ে পরীক্ষা — এই পরীক্ষার বীভৎসতায় শতকরা ৯০ ভাগ বন্দী মারা যেত। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা।

সব মিলিয়ে ৫,০০,০০০ জিপসি, অন্তত ২৫০,০০০ প্রতিবন্ধী মানুষ এবং ৩০,০০,০০০-র বেশি সোভিয়েট যুদ্ধবন্দী নাৎসি অত্যাচারের বলি হল।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

উমা

'দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে'

দুধ খেলেও দুষ্টু ছেলে

অরুণালোক ভট্টাচার্য

দুধ বলতে আমরা আলোচনা করব গোরু বা মোষের দুধ। শুরুতে বলে নিতে চাই, এই আলোচনা কোনওভাবেই মাতৃদুগ্ধের সমালোচনা বা মাতৃদুগ্ধের বিকল্প খোঁজার জন্য নয়। এই আলোচনা শুধুমাত্র গোরু বা মোষের দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়েই।

আজকাল ডাক্তারবাবুরা দুধ খেতে অত উৎসাহ দেন না। কারণটা বুঝতে গেলে চতুষ্পদজ দুধের উপাদানগুলি সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা দরকার। অন্যান্য সব খাদ্যবস্তুর মতো এতেও প্রোটিন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট আছে। ঝামেলা পাকানোর জন্য দায়ী হল, ল্যাক্টোজ নামক কার্বোহাইড্রেট আর মূলত বিটা ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন নামধারী হোয়ে (whey) প্রোটিন। ফলে পেটরোগা বাঙালির পৈটিক সমস্যার বহুলাংশই বোধহয় দুগ্ধজাত। দুধের ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজে ভাঙে ল্যাক্টোজ নামে একটি এনজাইম। এই এনজাইমটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরীণ কোষগুলির ডগায় অবস্থান করে। এই এনজাইমটি কোনও কারণে উপস্থিত না থাকলে, স্বভাবতই ল্যাক্টোজ পাচনে বিস্তর গণ্ডগোল শুরু হয়। এবারে প্রশ্ন হল, ল্যাক্টোজ ভেঙে গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ না হলেই বা কি মহাভারতটা অশুদ্ধ হবে, আর কেনই বা এনজাইমটি পরিমাণ মতো থাকবে না? ল্যাক্টোজ এনজাইমের অনুপস্থিতিতে, অপাচিত ল্যাক্টোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রের দিকে রওনা দেয় ধীরে ধীরে। সেখানকার ব্যাক্টেরিয়া অপাচিত সেই ল্যাক্টোজকে ভেঙে ফেলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, ল্যাক্টিক অ্যাসিড এবং ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে। ফলস্বরূপ পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা এবং বাঙালির অলঙ্কার বিখ্যাত 'গ্যাস' এবং পেট ফাঁপা।

ল্যাক্টোজ এনজাইমটি শরীরে অনুপস্থিত থাকতে পারে বিভিন্ন কারণে। তার সাময়িক অনুপস্থিতি ঘটতে পারে পেট খারাপ হওয়ার পরে। তবে এটি স্থায়ী হয় মাত্র কয়েকদিন।

কিন্তু জিনগতভাবে পৃথিবীর বহু মানুষের শরীরে এই এনজাইমটি অনুপস্থিত। মানুষ আদতে স্তন্যপায়ী। স্তন্যদুগ্ধ ল্যাক্টোজসমৃদ্ধ। সেই ল্যাক্টোজ পাচনে ল্যাক্টোজ এনজাইমটি বিবর্তনগতভাবে মানুষের জীবনের প্রথম কয়েকটি মাসে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত। কিন্তু শক্ত খাবার শুরু করার পর থেকেই অর্থাৎ ৬ থেকে ৮ মাসের পর থেকেই ল্যাক্টোজ এনজাইমটির উপস্থিতির খামখেয়ালিপনা অত্যন্ত প্রকট। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, যে দুনিয়ার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের শরীর থেকেই ল্যাক্টোজ এনজাইম ধীরে ধীরে গায়েব হয়ে যায়। পরিভাষায় এদের বলা হয় ল্যাক্টোজ নন্ পার্সিস্টেন্স বা ক্ষণস্থায়ী ল্যাক্টোজ। এঁরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর দুগ্ধজ ল্যাক্টোজ হজমের গণ্ডগোলে ভুগতে থাকেন। দুধ এঁদের হজম করতে অসুবিধে হয়। প্রশ্ন হল, কেন পৃথিবীর ৩০ ভাগ মানুষ দুধ হজম করতে পারবেন, আর বাকিদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে, বিবর্তনের পথ ধরে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পোষ মানিয়ে, সেই সব প্রাণীজ দুধ এবং অন্যান্য ভোজ্যবস্তুকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার প্রচলন হয় মাত্র ৫০০০ বছর আগে। সুতরাং তার আগে পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য দুধ হজম করার দায় মানুষের ছিল না। সুতরাং ৬ মাস থেকে ১ বছরের পরে মাতৃদুগ্ধ হজম করার জন্য মানুষের শরীরযন্ত্র একেবারেই তৈরি ছিল না। প্যালিওলিথিক যুগে ফল এবং মাংস ছিল মানুষের মূল খাদ্য। মানুষের পাচনযন্ত্রও সেইভাবেই গড়ে উঠেছে। গব্যোৎপাদন বা ডেয়ারি ফার্মিং-এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তুর ব্যবহার বাড়তে থাকল, বয়স নির্বিশেষে। সুতরাং মনুষ্য-শরীরযন্ত্রের তারও সেইভাবেই বাঁধা হতে থাকল। তাই বোধহয় ৫০০০ বছরে শতকরা মাত্র ৩০ জনের শরীরে ল্যাক্টোজ এনজাইমটি উপস্থিত। বাকিদের শরীরে সেই এনজাইমের উপস্থিতি থাকবে কি না, সেটি ভবিষ্যতের জিন-ঘণ্টই নির্ধারণ করতে পারবে। সারা দুনিয়া জুড়ে বহু দেশের মানুষের শরীরেই ল্যাক্টোজ এনজাইমের ঘাটতি, পরিভাষায় যাদের বলা হয় Lactose non persisters । উত্তর ইউরোপের (স্ক্যান্ডিনেভিয়া, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন) ২-৫%, ফিনল্যান্ড এবং উত্তর ফ্রান্সের ১৭%, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার ৫০% এবং বিস্ময়করভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৮০-১০০% মানুষই Lactose non persisters . আমাদের দেশেও এই ল্যাক্টোজ সমৃদ্ধ মানুষের প্রকারভেদ আছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এবং গো-বলয়ের মানুষ তুলনামূলকভাবে ল্যাক্টোজ এনজাইম বেশি। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ মানুষই Lactose non persisters। আমরা যেহেতু ভারতের পূর্বদিকের বাসিন্দা, আমাদের শরীরে ল্যাক্টোজ এনজাইমের ঘাটতি থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়। তাই বোধহয় মিষ্টান্ন-প্রিয় বাঙালি প্রতিনিয়ত গ্যাস-অম্বলে ভুগতে থাকেন।

সুখের কথা হল, পেটের রোগ বা আন্ত্রিকের পরে ল্যাক্টোজ এনজাইমের যে সাময়িক ঘাটতি হয়, তা ৬-৭ দিনের মধ্যেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু যাদের জিনগতভাবে শরীরে ল্যাক্টোজ এনজাইমের ঘাটতি আছে, তাদের দুধ হজম করার সমস্যা থাকবে জীবনভর।

এবারে আলোচনা করব গোদুগ্ধ-প্রোটিনের অ্যালার্জি নিয়ে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা উচিত, বাজারে শিশুদের উপযুক্ত যে সব দুধ পাউডার রূপে বিক্রি হয় সেগুলি সবই গোদুগ্ধজাত। মানুষের খাবারের থেকে যত অ্যালার্জি হয়, তার মধ্যে গোরুর দুধের অ্যালার্জি সবচেয়ে বেশি। গোরুর দুধের অ্যালার্জি শুরু হতে পারে জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই। কোনও শিশু যদি বুকের দুধের সঙ্গে বা শুধুমাত্র গো-দুগ্ধর উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে তার অ্যালার্জি সংক্রান্ত উপসর্গ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এটা জেনেও আপনারা আশ্চর্য হবেন যে কোনও কোনও শিশু, যারা শুধুমাত্র মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল, তারাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে, গোরুর দুধের অ্যালার্জির উপসর্গ নিয়ে হাজির হয়। এবার প্রশ্ন হল শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধপায়ী এই শিশুটি গরুর দুধের সংস্পর্শে এল কিভাবে? উত্তরটা হল— মায়ের খাবারের মধ্যে দিয়ে। মা যদি গোদুগ্ধজাত কোনও খাদ্যবস্তু খান, তবে সেই দুগ্ধজ প্রোটিন মায়ের বুকের দুধের মধ্যে দিয়ে শিশুর অন্ত্রে প্রবেশ করে অ্যালার্জি ঘটতে পারে।

তাহলে এই অ্যালার্জির উপসর্গই বা কি আর এটি ল্যাক্টোজ বদহজমের থেকে আলাদাই বা করব কিভাবে? গোরুর দুধের অ্যালার্জি সাধারণত দু'রকম উপসর্গ নিয়ে আসতে পারে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজনিত উপসর্গ এবং একটি বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার জন্য। প্রথমটিতে দুধ খাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপসর্গের সূত্রপাত। আর বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় রোগ জানান দেয় কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনের মধ্যে। গোদুগ্ধ প্রোটিনজাত অ্যালার্জির কি সেই উপসর্গ? পেটের রোগের বিভিন্নরকম উপসর্গ যেমন--- পাতলা পায়খানা,

কোষ্ঠ-কাঠিন্য, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা, পেটব্যথা, পেটে অস্বস্তি। ৫০-৬০ শতাংশ শিশুদের অন্যান্য উপসর্গ যেমন হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া বা বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ সহযোগে শ্বাসকষ্টও হতে পারে। ২০-৩০ শতাংশ শিশুদের চামড়ার অ্যালার্জির মতো উপসর্গ যেমন — গাল লাল হয়ে যাওয়া, চোখ এবং ঠোঁট ফুলে যাওয়া, শরীরে আমবাতের মতো অ্যালার্জি বেরোতে পারে। ল্যাক্টোজ পাচন সম্বন্ধীয় উপসর্গ যেমন শুধু এবং শুধুমাত্র পেট এবং অন্ত্র সম্পর্কিত, গোদুগ্ধ প্রোটিনের অ্যালার্জি কিন্তু পেট ছাড়া অন্যান্য শরীরযন্ত্র সম্বন্ধীয় হতেই পারে।

তবে, এই অ্যালার্জির সমস্যা শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই তিন বছরের মধ্যেই কমে যায়। পাঁচ বছর বয়সের পরে, আশ্চর্যজনকভাবে, মানুষ এই অ্যালার্জির সমস্যার উপসর্গ কাটিয়ে ওঠে। সুতরাং যাবতীয় সাবধানতা প্রথম দু'বছরের জন্যই। কী সেই সাবধানতা? গোরুর দুধ বা গোদুগ্ধজাত কোনও খাদ্যবস্তু শিশুকে দেওয়া চলবে না। যে শিশুটি শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধে লালিত, সেই মাকেও এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাহলে যে সব শিশু কৌটোর দুধের উপর নির্ভরশীল, তারা কি করবে? এদের জন্য বরাদ্দ এক্সটেনসিভলি হাইড্রোলাইজড বা শুধুমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড সম্বলিত দুধ। এই বিশেষ ধরনের গোরুর দুধে প্রোটিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে তার প্রাথমিকরূপী রাসায়নিক যৌগ বা অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিবর্তন করে ফেলা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিনের এই ভগ্নরূপটি মনুষ্য শরীর অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্য গোরুর দুধের অ্যালার্জিতে সয়াবিনের দুধ ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। সয়বিনের দুধের ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা হতে পারে। প্রথমত যে শিশুরা গোরুর দুধের অ্যালার্জির সমস্যায় ভুগছে, তাদের মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ৩০ জনের সয়াবিন প্রোটিনেও অ্যালার্জি থাকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের নিয়ামক সংস্থা ছ'মাস বয়সের আগে সয়াবিন প্রোটিনজাত দুধ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? আদতে সমস্যাটা গোরুর দুধ নিয়েই। ল্যাক্টোজ এনজাইমের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ শিশুরই ছ'মাসের পর থেকে শরীরে মাত্রা কমতে শুরু করে। তার মানে দেখুন, প্রথম ছ'মাস মাতৃদুগ্ধই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। তারপরই প্রকৃতি-মাতা বাদ সাধেন অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধ আহরণে। গোরুর দুধের অ্যালার্জির আয়ু ২ থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত। সত্যি কথা বলতে, তারপরে শিশুটির আর দুধের বয়সে থাকে না। অন্য সুষম আহার সে খেতেই পারে। সুতরাং এনজাইমের ঘাটতিই বলুন বা অ্যালার্জিই বলুন, ২ বছর পর্যন্ত শিশুদেরই যত ঝামেলা। প্রাকৃতিক নিয়মে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুধ নির্দিষ্ট থাকে তার শাবকের জন্য। শাবককে বঞ্চিত করে, সেই দুধ অন্য কেউ ব্যবহার করলে বাদ সাধেন প্রকৃতি মাতা। তাঁর কোনও সন্তান ভেদাভেদ নেই। তাই বোধহয় তিনিই চান না যে অন্যের শিশুকে বঞ্চনা করে মনুষ্য-শিশু সমৃদ্ধ হোক।

তথ্যসূত্র:

১. Lactose intolerance and gastrointestinal cow's milk allergy in infants and children - common misconceptions revisited Ralf G. Heine, Fawaz AIRefaee, Prashant Bachina, Julie C. Leon, lanlan Geng, Sitang Gong, Jose Armando Madrazo, Jarungchit Ngamphaiboon, Christina Ong, and Jossie M. Rogacion World Allergy Organ J. 2017; 10 (I):41. Published online 2017 Dec 12 doi: 10.1186/s40413-017-0173-0

২. https://i.redd.it/ez0zj44yk49z.png-Lactose intolerance map of the world

৩. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, Dias JA, Heuschkel R, Husby S, et al. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guidelines. Journal of Pediatric Gastroentreology and Nutrition. 2012 Aug; 55 (2): 221-9.

উমা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ থেকে উৎসমানুষ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার দাম ৩০ টাকা করা হল। বিশেষ সংখ্যার দাম হবে ৪০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা

পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

Punjab National Bank, College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

ভারতের আর্থিক সমস্যাগুলোকে আরও প্রকট করেছে কোভিড-১৯

শৈবাল কর

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ইদানিং যে সমস্ত বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান, যেমন সংযুক্ত রাষ্ট্র, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিভিন্ন মতামত জানাচ্ছে এবং যেগুলো থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আর্থিক অবস্থা উদ্বেগজনক, তার সবটাই শুধুমাত্র কোভিড-এর কারণে গত ছ'মাসের মধ্যে ঘটেছে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। একটি দেশের আর্থিক পরিবেশ এবং পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তার সহনক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে দেশের মানুষ কিসের ওপর নির্ভর করবেন আর কত তাড়াতাড়ি পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাবে সেটা একটি দেশের উন্নয়নের সূচক হওয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করেন। অর্থনীতির আলোচনায় ব্যবসা-চক্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়, এবং আমরা সবাই মোটামুটি অবগত যে সারা বছর কিংবা একটানা বেশ কয়েক বছর ব্যবসার হাল হকিকত একইরকম থাকে না। 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়' ব্যাপারটি ব্যবসার ক্ষেত্রে যে ভীষণ রকম প্রযোজ্য তা আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে যাঁরাই বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা জানবেনই। কোনও কোনও দেশের ক্ষেত্রে এই ব্যবসা-চক্রের সুসময় আর দুঃসময় প্রায় এক দশক ধরে চলতে থাকে পরপর। আমেরিকায়, ডেমোক্রাট আর রিপাবলিকানরা যখন মোটামুটি ৮ বছর অন্তর ক্ষমতায় আসেন, সেই সময়কাল অনুসারে ব্যবসাচক্র আবর্তিত হতে থাকে। রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টনের সময়ে অর্থনীতির যে ভীষণ উন্নতি হয়েছিল, চলেছিল প্রায় এক দশক ধরে, তা জুনিয়র বুশ ক্ষমতায় আসার পরে আবার নিম্নগামী হয়ে পড়ে— চাকরি সৃষ্টি কম, অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, জঙ্গি আক্রমণ ইত্যাদি বহু কারণেই অর্থনীতির চাকা থমকে যেতে শুরু করে। সেই অর্থনীতি আবার খানিকটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ওবামা নির্বাচিত হওয়ার পরে, যদিও ৯০-এর দশকে যে আর্থিক বিকাশ এবং ক্ষমতায়ন দেখেছে আমেরিকার জনগণ, তার থেকে অনেক কম হারে উন্নয়নের প্রমাণ মেলে পরের দশকে। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে আমেরিকাতে বৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুত হারে, তবে শুধু সেটুকুই মোট প্রাপ্তি নয়। এই সময়ে কর্মসংস্থান এবং বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে প্রায় সব কটি রাজ্যে। সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ ছাড়াও যে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে এটি উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত। অনেকে মনে করেন যে অন্তর্জাল আর দূরভাষ নিয়ন্ত্রিত ব্যবসার প্রসার ঘটেছে বলেই এই উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অবশ্য মনে করেন যে সব কিছুতেই তথ্য প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার হতে থাকলেও আসলে কিন্তু তার উৎপাদনশীলতা তেমন কিছু ছিল না। বরং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিনিয়োগ থেকে মূলধনের প্রাপ্তি বাড়াতে সাহায্য করে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, ৯০-এর দশকের শেষ দিকে মাইক্রোসফট্ কোম্পানির বিরুদ্ধে আমেরিকার সরকার অ্যান্টি-ট্রাস্ট বা একচেটিয়া ব্যবসার আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনে। মনে রাখবেন, মাইক্রোসফট্ তখন আমেরিকাতে শুধু যে শক্তিশালী একটি কোম্পানি তাই নয়, তারা কর্মসংস্থানে অগ্রগণ্য, আর সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার বিষয়েও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা। তা সত্ত্বেও, বেসরকারি ব্যবসা যাতে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তার প্রয়াসে ঘাটতি হয়নি। অনেকেই হয়ত বলবেন যে এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আমেরিকা আসলে অন্যায্য ব্যবসার প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। হয়ত সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ নয়, কিন্তু এটা অনেকেই জানেন না যে সামান্যতম অভিযোগ পেলেই

রাষ্ট্রের মূল সিদ্ধান্ত যাঁদের হাতে তাঁরা কতটা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করছেন আর্থ-পরিবেশ সংক্রান্ত অবস্থানের পরিবর্তনে তা অচিরেই নির্ধারণ করে দেবে একটি দেশ আবার উঠে দাঁড়াবে নাকি একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে। যেমন, আগের আর্থিক সংকট উন্নত দেশগুলোকে বেশ বিপর্যস্ত করলেও তাদের মেরুদণ্ড কিন্তু ভেঙে দিতে পারে নি।

কিন্তু কোম্পানির বিরুদ্ধে রীতিমতো তদন্ত করতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। দুর্নীতি কিংবা অধিকার ভঙ্গের অনেক অভিযোগ যেমন ওঠে তেমন তার বিচার হতেও সময় লাগে না, কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভবত পুঁজির স্বার্থ সুরক্ষাতেই নিয়ম বহির্ভূত কাজ করে পার পাওয়া যায় না। দেশের ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করে বাহামা পালিয়ে যাওয়া, কিংবা কর ফাঁকি দিয়ে দুবাইতে বসবাস করা আমেরিকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে সহজেই করে ফেলা শক্ত। এর সবথেকে বড় কারণ হল যে গভীর রাজনৈতিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্রাট বা রিপাবলিকান দলের কোনও ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রপতিও দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে নষ্ট করতে পারেন না। উন্নয়নশীল দেশের বহু নেতা নেত্রী কিন্তু প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন আগে, এবং এখনও সুযোগ পেলেই ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে অন্যায্য সুবিধা ভোগ করে থাকেন। একটি দেশ উন্নত হতে গেলে সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি সংশোধন করা কত গুরুত্বপূর্ণ, তা আজকের এই আর্থিক দুরবস্থা আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

এই উদাহরণগুলো দেওয়ার কারণ একটিই। অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বদলে ফেলা ইন্দ্রজালের বিষয় নয়। একরাত্রে তা ঘটে না, পরিবর্তনের অভিমুখ ভালোর দিকেই হোক বা বিপর্যয়ের দিকে। মনে রাখবেন, ২০০৮ পরবর্তী কয়েক বছরে অর্থনীতির চেহারা আজ আমরা যে অবস্থায় দেখছি গোটা বিশ্বকে তার থেকে বিশেষ ভালো ছিল না। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই মুহূর্তে ভারতের বৃদ্ধির হার নিয়ে চিন্তিত স্বাভাবিক কারণেই, বৃদ্ধির হার শূন্যের অনেক নীচে বলেই শুধু নয়, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে আবার ১০% বৃদ্ধির হারে ফিরে যেতে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে তার সহনশীলতা ভারতের মতো এখনও দারিদ্র্য প্রধান দেশের আছে কিনা, তা নিয়েও।

বিগত আর্থিক সংকটের সময়ে জাতীয় আয়ের পতন ঘটেছে স্বাভাবিক কারণেই, উৎপাদন কমার দরুণ এবং বহু কর্মী কর্মহীন হয়ে পড়ার কারণে। কোভিড-এর ক্ষেত্রে যেমন পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হল, একইরকম উদ্বেগ গৃহঋণ সংক্রান্ত অনিয়ম থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছেয়ে ফেলেছিল গোটা বিশ্বকেই। সেই সময়ে আশ্চর্যজনকভাবে ভারতে কিন্তু বড়সড় প্রভাব পড়ে নি কারণ ব্যবসার তুলনামূলক অবস্থান ভারতের ক্ষেত্রে এখনও অনেক বেশি অসংগঠিত পর্যায়ের। সেই কারণে, আন্তর্জাতিক মূলধনের বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে যে সমস্যাগুলো সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা সীমিত হয়ে যায় আমাদের দেশে এসে। হয়ত এদেশের মানুষ আশা করেছিলেন যে করোনার প্রভাব দেশের সীমানা পার করে ঢুকলেও তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। সেইরকম ধারণা অসম্ভবও নয় এক অর্থে। ভারতে এখনও কোটি কোটি মানুষ যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকেন এবং যে দূষিত খাদ্য পানীয় নিয়মিত গ্রহণ করে থাকেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নতুন কোনও জীবাণু আর অধিক কি বিপদ ডেকে আনতে পারে?

আর্থিক পরিবেশ আর জলবায়ুর দরুণ সামাজিক পরিবেশ, দুটোই কিন্তু একটি দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর বিশেষ রকম নির্ভরশীল। যে দেশে পরিবেশ দূষণ খুব বেশি, সেখানে সরকারি শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট পটু কিনা, এবং সরকার এই বিষয়গুলোকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তার অনেক সূচক পাওয়া যায় সহজেই। এই মুহূর্তে যাঁরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে খোঁজ রাখছেন তাঁরা জানবেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা সংক্রান্ত বিবেচনা মানুষের মধ্যে এমন সন্দেহের সৃষ্টি করেছে যা তাঁর নির্বাচনী বক্তব্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে। সোজা কথায়, রাষ্ট্রের মূল সিদ্ধান্ত যাঁদের হাতে তাঁরা কতটা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করছেন আর্থ-পরিবেশ সংক্রান্ত অবস্থানের পরিবর্তনে তা অচিরেই নির্ধারণ করে দেবে একটি দেশ, আবার উঠে দাঁড়াবে নাকি একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে। যেমন, আগের আর্থিক সংকট উন্নত দেশগুলোকে বেশ বিপর্যস্ত করলেও তাদের মেরুদণ্ড কিন্তু ভেঙে দিতে পারে নি। দু-তিন বছর বেশ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমেরিকা কিংবা পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় এখনও ঈর্ষণীয় স্তরের এবং ভারতের পক্ষে তা ছোঁয়ার আশা অলীক কল্পনা বৈ কিছুই নয়, কারণ, করোনা সমস্যা আসলে আমাদের অর্থনীতির কঙ্কাল কিরকম দেখতে তা প্রকট করেছে। অথচ, আর্থিক সংস্কার পরবর্তী সময়ে যে দ্রুত পরিবর্তন আর বৃদ্ধির হার এই দেশের মানুষ দেখেছেন তাতে মনে হয় নি যে কিছুদিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে দেশ একেবারে শূন্যের ২৪ শতাংশ নীচে বৃদ্ধির হারে পৌঁছবে। তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে অন্য কোনও দেশেরই এই দুরবস্থা হয় নি, কারণ চীন এর মধ্যেই ৩-৪% বৃদ্ধির হারে ফিরে এসেছে, পশ্চিমের দেশেও বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান ভারতের থেকে অনেক ভালো, প্রতিবেশী দেশগুলো মাথাপিছু আয়ের নিরিখে উন্নত অবস্থায়। তাহলে শুধু ভারতে এরকম অবস্থা হল কেন? এদিকে লকডাউন করে সংক্রমণ কমানো গিয়েছে তাও তো নয়। সংক্রমণের পরিসংখ্যানে সব দেশের মধ্যে সেরা অবস্থান। এর দায় আমাদের অর্থনৈতিক

চিন্তকরা— যাঁরা সরকারের মন জুগিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাঁরা এড়াতে পারেন না। শোনা যায় যে একটি প্রদেশের একটি শহরের কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে দেশে নোটবন্দি করলেই নাকি সমস্ত কালো টাকা হু-হু করে বেরিয়ে আসবে লুকোনো ভাণ্ডার থেকে এবং প্রধানমন্ত্রী তার কালো টাকা আদায়ের প্রতিশ্রুতি পালনে একেবারে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ভারতের ইতিহাসে। নোটবন্দি করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কত কালো টাকা উদ্ধার করেছে তার হিসেব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজও দিতে পারে নি দেশের মানুষকে। অথচ, যা সরকারি পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ের ৪৯% আসে যে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে তাকে প্রায় সমূলে উৎপাটন করে ফেলেছে এই নীতি। অসংগঠিত ক্ষেত্র দেশের কাছে খুব গর্বের বিষয় তা মনে করার কোনও কারণ নেই অবশ্যি। কিন্তু যে দেশের সরকার যথেষ্ট কর্মসংস্থান করতে পারে না আর নিম্ন আয়ের মানুষের জন্যে ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দিতে পারে না স্বাধীনতা পাওয়ার ৭৫ বছর পরেও, তাদের পক্ষে জোর করে নিজেকে বড় দেখানোর ইচ্ছে রাজনৈতিক আত্মহত্যার সামিল। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে দেশের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া পুঁজি পরিশোধ না করেই কতজন শিল্পপতি অন্য দেশে পলায়ন করেছেন এবং তাদের ফেরত আনার ব্যাপারে সরকার যে খুব উন্মুখ তা একেবারেই মনে করার কোনও কারণ নেই। উপরন্তু, যারা দেশের মধ্যে সৎ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, তাঁরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বেশি হারে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা গচ্ছিত সঞ্চয়ের ওপর অত্যন্ত কম হারে সুদ পাচ্ছেন। এর পুরোটাই হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাঙ্ককে সাহায্য করার তাগিদে কারণ এদের কাছ থেকেই কোটি কোটি টাকা ধার নিয়ে যারা বিদেশে পালিয়েছেন তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় হওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। পরবর্তীকালেও অবাক হতে হবে কারণ এর পরে কোনওদিন যদি এই ঋণ পুনরুদ্ধার করা যায়, আর সেই টাকা অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হতে থাকে, তাহলে সুদের হার নেমে আসবে আরও নীচে, এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থের আর কোনোই মূল্য থাকবে না দেশের আর্থিক ব্যবস্থায়। ভীষণ উন্নত জাপানে সুদের হার শূন্য হয়ে যাওয়া আর ভারতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির অন্দরে বসে সুদের হার শূন্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এই সরকার, এটা সত্যি নয়। সুতরাং, এমন যদি ঘটে তা যে পূর্বপরিকল্পিত তা মনে করার প্রয়োজন আছে। দারিদ্র্য বাড়লে যে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে বহু মানুষ তা ক্ষমতায় ফিরে আসতে গেলে বেশ কাজে লাগে।

এছাড়া রয়েছে জিএসটির প্রভাব। একথা সত্যি যে জিএসটির প্রস্তাব পূর্বতম সরকারের আমলে এসেছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি কারণ তখম এরাই বিরোধী পক্ষ ছিলেন এবং আর্থিক পরিবেশ সমীচীন ছিল না। তাহলে ক্ষমতায় এসেই তৎক্ষণাৎ জিএসটি প্রবর্তন করার মতো অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হল অর্থনীতিতে সে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ আছে নিশ্চয়ই, আপনি ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব নিয়ে বিচলিত না হলেও, তা আছে। জিএসটি যদি দিতেই হয়, তা হলে তা বড় সংস্থাকে সাহায্য করে কারণ তাদের উৎপাদন খরচ কম, পকেট অনেক গভীর, যাতে হাত ঢোকালে অনেক দিন পর্যন্ত চলে যাবে আর ক্ষতি হলেও তা সামাল দেওয়ার মতো আর্থিক ভারসাম্য আছে। এগুলো একদিনে হয় নি। ওরা হয়ত সত্যি ভালো ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বলে তা ধীরে ধীরে আয়ত্ব করেছে। অথবা, তেমন ভালো না হওয়া সত্ত্বেও সরকারি বদান্যতায় আর রাজনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে দেশে বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছে, অথচ ছোট অসংগঠিত ব্যবসার উৎপাতের কারণে সম্পূর্ণ বাজার করায়ত্ব হয়নি। জিএসটি সে সুযোগ করে দিয়েছে, কারণ জিএসটি দিয়ে ব্যবসায় টিকে থাকাই সম্ভব হবে না ক্ষুদ্র ব্যবসার পক্ষে, তাদের অত বিক্রিও হয় না, আর হিসেব নিকেশ দাখিল করার জটিলতা নিয়ে চলতে গেলে তাদের যা অতিরিক্ত খরচ হবে তাতে ব্যবসা করা পোষাবে না। তখন পুরো বাজারে একচ্ছত্র ব্যবসায় আর কোনও বাধা থাকবে না বড় ব্যবসার কাছে। এরাই তো রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে নির্বাচনের আগে কোটি কোটি টাকার খরচ জুগিয়ে।

তবে এদেশের মানুষ আবার ধর্মের নামে নিজের খাবারটুকুও হয়ত তুলে দিতে প্রস্তুত থাকেন দুর্বৃত্তের হাতে। সুতরাং দেশের মানুষের চেতনার অবস্থা যদি একবার বুঝে যায় সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন, তাহলে তাকে পিষে ছিবড়ে করে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই গত পাঁচ বছরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি, করোনা তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মাত্র। সুতরাং, যাঁরা বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ করেন অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে তাঁরা মনে রাখবেন যে করোনার দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কিন্তু ভারতের সমস্যা জারি থাকবে ভুল কিছু পদক্ষেপের জন্যে। করোনাকালে লকডাউন করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হতে পারত যে স্বল্পমেয়াদে কৃচ্ছসাধন করে দীর্ঘমেয়াদে দেশকে উন্নয়নের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যায় কত শীঘ্র। অথচ, এযাবৎ যা প্রস্তাবনা দেখা গেছে সরকারের তরফে তাতে ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে সন্দেহ রয়ে যায়। তবে এই ধরনের সমস্যা নতুন বলেই হয়ত এর থেকে পরিত্রাণের সঠিক উপায় জানতে গেলে সময়ের উপর ভরসা করা ছাড়া বিশেষ করণীয় নেই।

উমা

অস্তিত্বের সংকটে প্রাণের উৎস

শ্যামল ভদ্র

পৃথিবীর জীববৈচিত্রে প্রাণের উদ্ভব এক বিস্ময়কর ঘটনা। গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর বিচরণে স্থলভূমি হয়েছে সুন্দর এবং বর্ণময়। বিশাল সমুদ্রের জলরাশি তৎসহ সামুদ্রিক প্রাণীজগৎ লক্ষকোটি বছর ধরে সমস্ত জীব জগতের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। বহুযুগ ধরে ধীরে ধীরে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। সেই সময়ে শেষপর্বের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের সৃষ্টি। তারপর শুরু হল মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। বাড়তে থাকল বেঁচে থাকার জন্যে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা।

প্রথমে পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন কিভাবে শুরু হল সে বিষয়ে একটা ধারণা করা যেতে পারে। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবীর সৃষ্টি সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত যে সৃষ্টির পরে একশো কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে ঝড়-বৃষ্টি-অগ্ন্যুৎপাত চলেছিল এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছিল স্থলভাগ এবং সমুদ্র। খানিকটা তপ্ত সমুদ্রে তৈরি হয় প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপ অর্থাৎ ঘন তরল পদার্থ যা নানারকম যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে তৈরি। এই তত্ত্বের বিষয়ে প্রথম প্রবক্তারা হলেন বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওপারিন ও জে বি এস হলডেন। ১৯২০-২৪ সালে ওঁরা বলেছিলেন যে প্রাণ সৃষ্টির মূলে রয়েছে পদার্থের অণু ও পরমাণুর সুবিন্যস্ত শৃঙ্খল, যার গঠনের মূলে হয়ত রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড। অনুমান এই আদিম ঘন তরল পদার্থেই প্রাণের সূচনা হয়েছিল।

সপ্তদশ শতকে ক্ষুদ্র একটি কোষের ভিতরে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়, এই কোষকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। এরও একশত বছর পরে প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর ''অরিজিন অফ স্পেসিস'' বইটিতে দেখিয়েছিলেন যে জীবের উদ্ভব হয়েছে একটি মাত্র প্রাণের উৎস থেকে। অর্থাৎ এই এক কোষী প্রাণীই হল জীব জগতের মূল উৎস। বিজ্ঞানীদের অনুমান ৩০০ কোটি বছর আগে ওই প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপে মাইক্রোবের বা প্রথম ব্যক্টেরিয়ার সৃষ্টি।

অধ্যাপক হ্যারল্ড উরি ১৯৩১ সালে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৩৪ সালে নোবেল প্রাইজ পান ডিউটেরিয়াম আবিষ্কারের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হ্যারল্ড উরি গুরুত্বপূর্ণ ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে হ্যারল্ড উরি এক ব্যতিক্রমী বক্তৃতায় বলেন যে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল যখন তৈরি হয় তখন অক্সিজেন ছিল না। তিনি আরও বলেন সম্ভবত মিথেন, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন আবহমণ্ডলের প্রধান উপাদান হিসেবে ছিল। ওই আলোচনা সভায় ছাত্রদের মধ্যে স্ট্যানলি মিলার উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে বিষয়টি ভীষণভাবে নাড়া দেয় এবং অধ্যাপক উরির কাছে গবেষণা শুরু করেন। উরির পরামর্শ মতো মিলার কৃত্রিম উপায়ে প্রায় অনুরূপ ওই প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপ তৈরি করতে সক্ষম হন। মিলার ও উরি ওই তরল বিশ্লেষণ করে দেখান যে অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লাইসিন ও আলামিন তৈরি হয়েছে ওই তরলে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডই জীববৈচিত্রের উৎসমূলে এক প্রয়োজনীয় উপাদান।

মিলার তৎক্ষণাৎ গবেষণাপত্র তৈরি করে উরিকে দেখান এবং উরি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করবার জন্যে বিখ্যাত 'সাইন্স' জার্নালে পাঠাতে বলেন। শুধু তাই নয়, নিজের নাম গবেষণা পত্রটিতে দিতে অস্বীকার করেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর নাম থাকলে মিলার তার কাজের উপযুক্ত গুরুত্ব ও স্বীকৃতি পাবেন না। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। গবেষণাপত্রটি ১৫ মে ১৯৫৩ সালে 'সাইন্স' জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়। প্রমাণ হল ওপারিন-হল্ডেন মডেল অর্থাৎ প্রাণের উৎসে অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতি। উরি বুঝেছিলেন যে মিলারের কাজটি প্রাণের উৎসের রহস্য সন্ধানে এক বিরাট পদক্ষেপ। স্ট্যানলি মিলারের নাম বেশ কয়েকবার নোবেল প্রাইজ-এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিলার এ বিষয়ে আরও গবেষণা করেন এবং অন্যান্য আরও গবেষণার ফল থেকে জানা যায় বেশ কিছু যৌগ পদার্থ ওই প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপে উপস্থিত ছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থে উত্তরণ। এই অ্যামনো অ্যাসিডই হল ডি.এন.এ বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের মূল উপাদান।

ডি.এন.এ. যা প্রাণের উৎস থেকে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বে বৈচিত্রের রূপ ও আকার নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে, সেই তত্ত্বের উদ্ভব এক আশ্চর্য গল্পকথার মতো।

আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোব বা ব্যক্টিরিয়ার আধার হচ্ছে সমুদ্র। এদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে সমুদ্রে অক্সিজেনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে। সমস্ত জীব জগতের বেঁচে থাকার জন্যে দরকার অক্সিজেন, যা বায়ুমণ্ডলে প্রায় ২১ শতাংশ রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। এই ২১ শতাংশ যদি ৩০ শতাংশ হয়ে যায় তবে আগুনে সব পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আবার ২১ শতাংশের কম হয়ে গেলে আবহমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হবে, শুরু হবে তুষার যুগের, ফলস্বরূপ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হল আবহমণ্ডলে অক্সিজেন এল কি করে এবং কীভাবে ২১ শতাংশে এই মাত্রা স্থিতিশীল হল।

আমরা সবাই শ্যাওলা (algae) দেখে অভ্যস্ত যা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যার পাতা বা মূল কোনোটাই নেই। সাধারণত জলের কাছে বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের গঠন আকারবিহীন এককোষী বা বহুকোষের সমষ্টি, যারা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। প্রথম প্রাণের স্পন্দন নিশ্চিতরূপে এই শ্যাওলার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ৩০০-২০০ কোটি বছর আগে এক ধরনের নীল সবুজ শ্যাওলা যার নাম সাইনোব্যকটেরিয়া (cynobacteria) সূর্যের আলো, জল ও কার্বনডাইঅক্সাইডের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে তৈরি করে অক্সিজেন ও কার্বোহাইড্রেট। এই অক্সিজেনের বেশ কিছু অংশ আবার সমুদ্রের জলে এবং সমুদ্রের তলদেশে পাথরে শোষিত হয়। ফলে আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় শূন্যই থেকে যায়। অন্যদিকে অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড নানারকম পাললিক পাথরে ও জৈব তেলে শোষিত হতে থাকে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সাথে সাথে। প্রায় ৮০ কোটি বছর আগে থেকে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধি পায় জলীয় বাষ্প। সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন বেরিয়ে আসতে থাকে, মূলত উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে জলীয়বাষ্প বিশ্লেষিত হওয়ার ফলে। ফলত ধীরে ধীরে আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে স্থলভাগ ও সমুদ্রের উপর বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণে বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি, যার ২১ শতাংশই অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে জলীয় বাষ্পে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে রাসায়নিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে। পরবর্তীকালে আবহ বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রভূত উন্নতি হওয়ায় আমরা জানতে পারি যে, অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীর বায়ুস্তরের উপরিভাগে ওজন স্তরে শোষিত হয়ে পুনর্নির্বেশ (ফিডব্যাক) পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই জটিল পদ্ধতিতে যে পরিমাণ অক্সিজেন এই সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে তাকে উরি

অক্সিজেন আবিষ্কারের রহস্য: আমরা জানি যে অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন ব্রিটিশ রসায়নবিদ জোসেফ প্রিয়েস্টলি (Joseph Priestley) কিন্তু এই আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে এক রহস্য। সুইডিশ ফার্মাসিস্ট কার্ল উইলহেম সিলি (Carl Wilhelm Scheele) ১৭৭২ সালে সহকারী ফার্মাসিস্ট হিসাবে সুইডেনের উপসালা (Uppsala) শহরে কাজ শুরু করেন। সেই সময়ে আগুন জ্বালার রহস্য ও বাতাসের ভূমিকা মানুষকে বিস্মিত করত, কিন্তু কারণ জানা ছিল না। উইলহেম সিলি বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে সিদ্ধান্তে এলেন যে, বাতাসের এক বিশেষ অংশের অভাবে আগুন জ্বলতে পারে না, আবার এই অংশটি বেশি পরিমাণে থাকলে আগুনের শিখা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন যে আমরা নিঃশ্বাসের সাথে প্রতিনিয়ত যে বাতাস গ্রহণ করি, তা পৃথিবী পৃষ্ঠে এক সম্পৃক্ত আবরণ তৈরি করে রেখেছে।

উইলহেম সিলি বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা দেখালেন যে, বাতাসে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও আরও একটি বড় নিষ্ক্রিয় অংশ রয়েছে, যা অতটা রাসায়নিকভাবে সক্রিয় নয়। পরে জানা যায় এটি নাইট্রোজেন গ্যাস। উইলহেম সিলি আরও দেখিয়েছিলেন যে, বাতাসের ওজন আছে এবং বাতাস চাপের প্রভাবে সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে। মজার বিষয় হল ব্রিটিশ রসায়নবিদ জোসেফ প্রিয়েস্টলি (Joseph Priestley) ১৭৭৪ সালের কোনও এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যান্টনি লাভোয়াজিয়ের (Antoine Lavoisier) প্যারিসের বাড়িতে মিলিত হন এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য। তাঁরা যখন তাঁদের অক্সিজেন আবিষ্কারের কথা আলোচনা করেছিলেন, ঠিক তার আগে লাভোয়াজিয়ের কাছে একটি চিঠি পৌঁছায়। কোনোভাবে চিঠিটি লাভোয়াজিয়ের অগোচরে থেকে যায়, যা পরবর্তীকালে লাভোয়াজিয়ের স্ত্রী চিঠিটি প্রকাশ করেছিলেন। এটি একটি বিরাট রহস্য। উইলহেম সিলি তাঁর আবিষ্কারের সবকিছু 'Chemical Treatise on Air and Fire' বইটিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৭ সালে। জোসেফ প্রিয়েস্টলি অবশ্য বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ পঁচিশ শতাংশ রয়েছে, তা পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে লাভোয়াজিয়েরও পরীক্ষা করে দেখেছিলেন বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতি। তাই উইলহেম সিলি, জোসেফ প্রিয়েস্টলি ও অ্যান্টনি লাভোয়াজিয়ের এই তিনজনকেই অক্সিজেন আবিষ্কারের সাথে যুক্ত করা যায়।

লেভেল বলে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ২১ শতাংশ যা জীব ও উদ্ভিদ জগতের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যা আমাদের শরীর-বৃত্তি ও প্রক্রিয়াকে সচল রাখে।

আশ্চর্যের বিষয় হল পঞ্চাশ-ষাট কোটি বছর আগে অক্সিজেনের পরিমাণ হঠাৎই ২১ শতাংশের অনেকটাই বেশি বেড়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি ভূ-বিজ্ঞানী ডোনাল্ড কেনফিল্ডের নেতৃত্বে ডেনমার্ক ও ফ্রান্সের একদল গবেষক এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ভূ-রাসায়নিক তত্ত্বের গবেষণার কেন্দ্র ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে মধ্য-আফ্রিকার ছোট্ট একটি খনিজ তেল সমৃদ্ধ দেশ গ্যাবন প্রজাতন্ত্র। সেখানে কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চিত পাললিক পাথরের দেওয়াল বা স্তরে (১০০০-২৫০০ মিটার) পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে ওঁরা দেখিয়েছেন যে ওই সময়ে অক্সিজেনর পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। কোটি কোটি বছর ধরে জমে থাকা পাললিক পাথরের দেওয়ালকে প্রখ্যাত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় 'পাহাড়ের বই' বা পাললিক পাথরের পাহাড় (বই : যে গল্পের শেষ নেই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, উৎসমানুষ), যার প্রতিটি খাঁজে খাঁজে জমে আছে বহু প্রাচীন সময়ের ইতিহাস ও জন্তু-জানোয়ার-গাছপালার ফসিল। আরও জানা যায় পরবর্তী পর্যায়ে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে কারণ আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত উদ্ভূত লোহার সাথে অক্সিজেনের পরিমাণ যা ওই পাহাড়ের বই থেকে জানা গেছে। পুনরায় অক্সিজেনের পরিমাণ ওই ২১ শতাংশের কাছাকাছি চলে আসে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে পৃথিবীর স্থলভাগের ঘন বনজঙ্গল বিশেষ করে বর্ষা-অরণ্য, মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও সমুদ্রের প্রাণীকুল বিশেষ করে মাইক্রোবের জীবনচক্র আমাদের বায়ুমণ্ডলের ২১ শতাংশ অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। এই পরিমাণ অক্সিজেনের ৬০ শতাংশই জোগান আসছে সমুদ্র থেকে। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের উদ্ভব এবং তার স্থায়িত্ব যা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বেঁচে থাকার জন্যে অনুকুল, সেই সাথে ডি. এন.এ. যা প্রাণের উৎসে অনন্তকাল ধরে বিভিন্ন রূপে বিরাজ করছে— সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা; যা পৃথিবীর ভূ-বৈচিত্র এবং জীব-বৈচিত্রের আশ্চর্য এক সিম্ফনি ও জটিল নৃত্যের মূর্চ্ছনা, আমাদের অগোচরে নিপুণভাবে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

পৃথিবী এখন ধীরে ধীরে উষ্ণায়ন পর্ব কাটিয়ে আবারও হয়ত তুষার যুগে প্রবেশ করবে, বলা যায় আমরা এখন অনাগত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। অথচ প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষই এই সুন্দর পৃথিবীকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। যে অরণ্য-বনাঞ্চল ও সমুদ্র আমাদের বেঁচে থাকার মূল স্তম্ভ আমরা তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে চলেছি। পৃথিবীর স্থলভাগ সীমিত— জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে হাজার হাজার বছর ধরে সৃষ্ট অরণ্যকে আমরা গ্রাস করে নিয়েছি। সমুদ্রোপকূলে খনিজ তেলের উত্তোলন এবং ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক প্রাণীর শিকারের ফলে সমুদ্রে অনেক প্রাণী বিলুপ্তির পথে। বেশ কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সঙ্গে সমুদ্রের অম্লতা বৃদ্ধিও যোগ হয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণার অনেক উন্নতি হয়েছে, জানা যাচ্ছে যে গভীর সমুদ্রে অক্সিজেনের পরিমাণ

তুষার যুগের প্রায় ২০ লক্ষ থেকে ১০০০০ বছর আগের সময়টাকে ভূতাত্ত্বিক স্কেলে (epoch) বলা হয় প্লেইস্টোসিন (pleistocene), এই সময়ের বহু জীবজন্তুর জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছে বরফের চাদর সরে যাবার পরে। ভূ-উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফের চাদর আস্তে আস্তে সরে যাবার ফলে জীবাশ্মগুলি দৃশ্যগোচর হয়। এইগুলি থেকে ভূ-বিজ্ঞানী ও জীব-বিজ্ঞানীরা তুষার যুগের আবহাওয়া, প্রকৃতি ও প্রাণীজগতের অতীত ইতিহাস জানতে সক্ষম হয়েছেন। ছবিতে সে যুগের বিশালকায় ম্যামোথ্যাসের জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে, বর্তমানে এটি রাখা আছে নিউইয়র্কের 'দি হিস্ট্রি অফ ন্যাচারাল মিউজিয়াম'-এর গ্যালারিতে। (ছবি - লেখকের তোলা)

কমে আসছে। সবথেকে বিপজ্জনক অবস্থা ওমান খাড়ি অঞ্চলে যেখানে সঞ্চিত খনিজ তেলের ভান্ডার সবথেকে বেশি। সহজেই অনুমেয় আমরা এক গভীর সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছি। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে একটি তিমি মাছের দল, সংখ্যায় প্রায় ৪০০, অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার সমুদ্র উপকূলে একসাথে তাদের মৃত্যু হয়। জানা যায় গত একশো বছরে ওই অঞ্চলে দু'বার এরকম ঘটনা ঘটেছিল। সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি, তবে এটুকু বলা যায় সামুদ্রিক প্রাণীকুলের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। আর স্থলভাগে মনুষ্যসৃষ্ট করোনা অতিমারীর বর্তমান সংকট মানুষকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। একটি ক্ষুদ্র ভাইরাস বা অণুজীব কিভাবে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, কয়েক লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন, এই সঙ্কটের নিরসন কবে হবে এখনও জানা নেই। মোটামুটিভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় এই সংক্রমণ এসেছে জন্তুদের কাছ থেকে। পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্যে নয়, জন্তুদেরও বিচরণ ভূমি, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে এলিজাবেথ কোলবার্ট-এর ২০১৫ সালে পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি বই 'দি সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন: অ্যান আনন্যাচারেল হিস্ট্রি' বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোলবার্ট বলেছেন যে মানুষের পরিবেশের উপর প্রভাব এতটাই মারাত্মক যে পৃথিবী ষষ্ঠবার ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ — এই বিপর্যয়ের শুরু যখন প্রাচীন বনমানুষ নিজেদের গণ্ডি ছেড়ে আন্তর্মহাদেশে পরিযাণ শুরু করে অর্থাৎ সেই নিয়ানডার্থাল ও হোমোসেপিয়েনদের সময়। অথচ তার আগে ওই সব মানুষ নিজেদের জায়গায় দলবদ্ধভাবে বাস করত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এবং ওইসব অঞ্চলের মানুষ দূরে অন্য জনগোষ্ঠীর খবর রাখত না হয়ত তার প্রয়োজনও পড়ত না। ধরেই নেওয়া যায় ওই সময়ে সমগ্র জীবজগৎ, বনাঞ্চল ও নদনদী পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছিল। কোলবার্টের মতে এই মানুষেরা যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল প্রকৃতির বিপর্যয় থেকে বাঁচার তাগিদে তখনই শুরু হল পরিবেশের ভারসাম্যের উপর আঘাত। কোলবার্ট উদাহরণ স্বরূপ দেখিয়েছেন যে যখন ১৯৩৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাঙের আমদানি করা হয় তখন বেশ কিছু পোকামাকড় ও গাছপালা ওই অঞ্চল থেকে বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্যাঙের আগমনে পরিবেশের নতুন অধ্যায় শুরু হল।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী কয়েক বছর আগে সমর সেন জন্মশতবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতায় 'মানবিক ও অমানবিক' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে পৃথিবীর মানুষ মাইক্রোব বা বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যাক্টেরিয়ার যা জল-স্থল সর্বত্র ছড়িয়ে আছে — তার খবর রাখে না তদুপরি আবহমণ্ডলে ওদের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণাই নেই। ফলত ওদের বাসস্থানে আমরা অনবরত আঘাত হেনে চলেছি। প্রধান উদাহরণ হল ব্যাপকভাবে সমুদ্র উপকূলে খনিজ তেলের উত্তোলন, মৎস্য শিকার এবং বিভিন্ন উপায়ে নদী ও সমুদ্রের জলকে কলুষিত করে তোলার সমষ্টিগত ফল হচ্ছে গভীর সমুদ্রে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ সর্বদাই প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে অদম্য লোভ। উন্নয়নের নামে মনুষ্যকৃত বিচিত্র কর্মকাণ্ডের নিট ফল হল বিশ্ব উষ্ণায়ন ত্বরান্বিত করা এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকা। ফলত অদূর ভবিষ্যতে আবহমণ্ডলে কার্বনডাই অক্সাইড বেড়ে যাবে এবং অক্সিজেন কমে যাওয়ার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ ষষ্ঠবার বিলুপ্ত হওয়ার মুখে অর্থাৎ আমরা 'সিক্সথ এক্সটিঙ্কশন'-এর সূচনাকালের মধ্য দিয়ে চলেছি, বাঁচার কোনও পথ খোলা রাখি নি।

অন্নদাশঙ্কর রায় 'গ্যেটে ও তাঁর দেশকাল' প্রবন্ধে গ্যেটেকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য

১৯৩৫ সালে কেন-টোড বা সোনালী রঙের কোলাব্যাঙ আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছিল আখের ক্ষেতে বড় আকারের কালো পোকাকে ধ্বংস করার জন্যে। অস্ট্রেলিয়ায় আখের চাষ ব্যাপকভাবে করা হয় চিনি উৎপাদনের জন্য, যা দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যাঙগুলি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কালো পোকাগুলি আখ গাছের পাতা খেয়ে নেবার ফলে উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হতে থাকে, পরিবেশ রক্ষার কারণে কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না, তাই সহজ সমাধান শস্যক্ষেতে ব্যাঙ ছেড়ে দাও। ফল হল মারাত্মক। কালো পোকার সাথে অন্যান্য পোকামাকড় খেয়ে সাবাড়। এভাবেই ওই অঞ্চলের জীববৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

করেছিলেন যে— ''আজ কি তাঁকে আমাদের দরকার আছে এই উন্মত্ত পৃথিবীতে? প্রগতির পথ ধরে ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা সভ্যমানব। বিজ্ঞান আমাদের বন্ধু নয়, যেমন ফাউস্টের বন্ধু নয় মেফিস্টোফেলিস...''। বর্তমান করোনা অতিমারীর কারণে বিশ্বের মানব সমাজ এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন, বিজ্ঞানের হাত ধরেই এই ভাইরাসের প্রতিষেধক ও ওষুধ আবিষ্কার হবে সেই আশা নিয়ে আমরা দিন গুনছি। এই সঙ্কট থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীকে মানুষ ও প্রাণীজগতের বসবাসের উপযুক্ত করে তুলতে হবে, দায়িত্ব আমাদের সবার, সেজন্য বিজ্ঞানকে বন্ধুর আসনে বসাতে হবে। উমা

কোভিড-বর্জ্য নিয়ে সচেতনতা জরুরি

নন্দগোপাল পাত্র

৩১ জানুয়ারি ২০২০ কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাড়িতে আসা সংবাদপত্রে ছোট্ট করে খবর ছিল, ''ভারতে করোনা''। ওই একই সংবাদপত্রে দ্বিতীয় দিন ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হল ''চিনের গণ্ডি পেরিয়ে আরও ১৮টি দেশে করোনা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে''। ২ ফেব্রুয়ারি করোনা নিয়ে খবর ছিল না। ৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল 'কেরালায় ফের হানা করোনার'। ধীরে ধীরে তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রভাবে এক লহমায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাও পাল্টে যায়। করোনা ভাইরাসের ভারতে উপস্থিতির বছর পার হতে চলল। ১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৪,৬২,৮০৯ জন, প্রাণ হারিয়েছে ১,৩৭,৬২১ জন, আমাদের রাজ্যে আক্রান্ত ৪,৮৬,৭৯৯, মৃত ৮৪৭৬। ১৪,৭৭,৩৩৯ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন গোটা বিশ্বে। ভারতে প্রথম এক লাখ সংক্রমিতের সংখ্যায় পৌঁছতে সময় লেগেছিল ১১০ দিন। আর জুলাই '২০-এর তৃতীয় সপ্তাহে এক লাখ মাত্র তিন দিনে। ওই সময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছিল সংক্রমণ এবং মৃত্যু। পরবর্তী সময়ে কোথাও হয়েছে গোষ্ঠী সংক্রমণ, আবার কোথাও সেকেন্ড ওয়েভ। ফলে বিশ্বের সর্বত্র অতিমারীই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোভেল করোনা ভাইরাসের জন্ম কোথায় তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে, কিন্তু করোনার ভয়াবহতা যে বিশ্ব অর্থনীতিকে টলিয়ে দিয়েছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কোভিড রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাড়ির বাইরে বেরোলেই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। আর কোভিড চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের জন্য মাস্ক, টুপি, গ্লাভস, গগল্‌স্ ও পিপিই ইত্যাদি। তাতে সংক্রমণ রোখা যাচ্ছে অনেকটাই, কিন্তু কোভিড বর্জ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্রসহ অন্যান্য মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া বর্জ্যগুলির ছবি। চিকিৎসক ও গবেষকদের মতে, যত্রতত্র মাস্ক, টুপি, গ্লাভস ও পিপিই ফেলে দিয়ে মানুষ নিজের অজান্তে সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন। কোভিড-১৯-এর প্রতিষেধক, সংক্রমণ আটকাতে কী কী করতে হবে— এমন হাজারো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কোভিড বর্জ্য মাস্ক, গ্লাভস বা পিপিই কীভাবে নষ্ট করতে হবে তা নিয়ে এখনও সচেতন নন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বর্জ্য সংগ্রহকারী সংস্থা, এমন খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের পাতায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর সচেতনতা না থাকার জন্য কোভিড বর্জ্য রাস্তায় পড়ে থাকতে বা অন্য চিকিৎসাজনিত বর্জ্যের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। সংক্রামিত নন এমন কেউ মাস্ক পরে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন, তাঁরা বাড়ি ফিরে অনেক সময় সেই মাস্ক (একবার ব্যবহার যোগ্য) বাড়ির বাকি বর্জ্যের সঙ্গেই ফেলে দিচ্ছেন আবর্জনার পাত্রে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা সংগ্রহ করছেন বর্জ্য কুড়িয়েগণ। তাঁরা জানতেই পারলেন না সেই মাস্ক কোনও সুস্থ মানুষ ব্যবহার করেছিলেন না অসুস্থ মানুষ। সর্বোপরি যেসব মানুষ বর্জ্য কুড়িয়ে রোজগার করেন, তাঁদের এই কোভিড বর্জ্য সম্পর্কে তেমন ধারণাই নেই যে, এই বর্জ্য কতটা ক্ষতিকারক। অর্থাৎ সুরক্ষা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে আমরা নিজেরাই একে অপরের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছি। অথচ বর্জ্য সংগ্রহ যাতে চূড়ান্ত সতর্কতার সঙ্গে সামলানো হয়, সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে।

ভারতে করোনা সংক্রমণের জন্য প্রতিদিনের বর্জ্য কতটা বেড়েছে? উত্তরপ্রদেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা যাচ্ছে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে গাজিয়াবাদে উৎপন্ন বায়োমেডিক্যাল

ওয়েস্টের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৫২.৭, ২৬৮৫.৭৩ এবং ১২৩২১.২ কেজি। তিন মাসে বৃদ্ধি প্রায় ৩৯০ শতাংশ। ওই জেলায় কোভিড সংক্রমণের আগে প্রতি মাসে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ ছিল ১১০০-১২০০ কেজি। আবার জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ওই প্রমাণ দাঁড়িয়েছে প্রতিদিন গড়ে ৭৫০-৮০০ কেজি। অন্যদিকে পুণে শহরে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিদিন কোভিড বর্জ্যের পরিমাণ ৩০০০ কেজি। ওই শহরে মার্চে উৎপন্ন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ছিল দিনে ২৫০ কেজি। কেরলের ইমেজ (ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন গোস ইকো-ফ্রেন্ডলি) একটা পরিসংখ্যান দিয়েছে। শুধুমাত্র পালাক্কড় ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টেই ১৯ মার্চ পর্যন্ত রোজ ৬৯৮ কেজির মতো বর্জ্য জমা পড়ত। ৩১ মে সেখানে দেখা গেছে ৪,৭১৫ কেজি বর্জ্য জমা পড়েছে। তিরুবনন্তপুরমে জমা পড়েছে ১৮,৯৪৫ কেজি। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে কোভিড অতিমারীর পর উৎপন্ন বর্জ্যের চিত্র প্রায়ই এক। এনভায়নমেন্ট পলিউশন (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অথরিটি সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছিল বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট মে ২০২০-তে প্রতিদিন ২৫ টন থেকে জুলাই ২০২০-তে বেড়ে হয়েছিল প্রতিদিন ৩৪৯ টন। অন্য এক পরিসংখ্যানে জানা যাচ্ছে জুন ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ কেবল মহারাষ্ট্রে কোভিড বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে ৩৫৮৭ টন, তামিলনাড়ু ১৭৩১ টন, গুজরাট ১৬৩৮ টন, কেরল ১৫১৬ টন, উত্তরপ্রদেশ ১৪৩২ টন, দিল্লি ১৪০০ টন, কর্ণাটক ১৩৮০ টন এবং পশ্চিমবঙ্গ ১০০০ টন।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের তথ্য বলছে, ১৯৯৮ সালের বন ও পরিবেশ দপ্তরের বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডলিং) রুলসকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে 'বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ২০১৬' জারি করা হয়। তাতে বলা আছে, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ক্লিনিক, পরীক্ষাগার, ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্র সহ যে সমস্ত জায়গায় বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য উৎপন্ন হয়, তার সবই এই আইনের আওতায় আসবে। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ওই আইনে আরও কিছু সংশোধন হয়। কোভিড বর্জ্য নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতও তাদের নির্দেশিকায় 'বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল' মেনে চলার কথা জানিয়েছে। সেই সঙ্গে 'Covid 19 BWM' ট্রাকিং অ্যাপ, Covid 19BWM Mobile and Web Portal App রূপায়ন করার নির্দেশ দিয়েছিল। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, জল শক্তি, আবাসন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চস্তরীয় কমিটি (High Level Task Team) গঠনের। ওই কমিটির ২৬ মে মিটিং-এর সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলোকে জানিয়ে দেয় ৩০ মে, ২০২০। এর পর ১০ জুন কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তৃতীয় বার সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করেছে। ১০ পাতার এই নির্দেশিকাগুলি অবশ্যই আইসোলেশন ওয়ার্ড, কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র, হোম কোয়ারেন্টাইনে আবদ্ধ রোগী, নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র, পরীক্ষাগারসহ স্থানীয় সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে রূপায়নের জন্য আমাদের রাজ্য কোভিড ১৯ বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রাকিং অ্যাপ-এর সাহায্য যেমন নিচ্ছে, তেমনই বারকোড যুক্ত হলুদ রঙের ব্যাগে বর্জ্য সংগ্রহ করছে। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এন্ড-টু-এন্ড জি পি এস ইন্সটলড বর্জ্য বহনকারী গাড়ি। উদ্দেশ্য একটাই কোভিড বর্জ্য থেকে সংক্রমণ শূন্য করা। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশকর্মীদের মতে, আইন হলেও অন্য সমস্ত কিছুর মতো তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ছ'টি 'কমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটিজ' (সিবিডব্লিউটিএফ) রাজ্যে কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করছে। পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা ২৩, কেবল মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ১২টি। টেস্টিং ল্যাবরেটরি ৯৫টি, ৪৫টি সরকারি হাসপাতালসহ মোট ১০২টি কোভিড হাসপাতাল, সেফ হোমের সংখ্যা ২০০ (১লা ডিসেম্বর স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী) যে সকল জেলায় একটিও সিবিডব্লিউটিএফ নেই, সেখানে কোভিড বর্জ্য কীভাবে নষ্ট করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার আরও ৭টি ফেসিলিটি সেন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এবং কোভিড বর্জ্য সংগ্রহের প্রতিটি ধাপে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে, তা হলফনামা দিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতকে জানিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

'করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে আজ পুরো

দেশ লড়ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের রোগের সঙ্গে লড়তে হবে, রোগীর সাথে নয়...'। ফোনে কারও নম্বর ডায়াল করলেই ভেসে আসে জসলিন ভাল্লা-র কণ্ঠ। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠ। এটি দেশবাসীকে সচেতন করার অন্যতম একটি সরকারি প্রয়াস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাবতে হবে রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি কোভিড বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গটিও ওই ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারে যুক্ত করা যায় কিনা। কোভিড বর্জ্য তো গত মার্চ থেকে এসেছে। কিন্তু তার আগে থেকেই সরকারি-বেসরকারি সমস্ত স্তরের বায়োমেডিক্যাল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ছিল। এর ফলে স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী, সাধারণ মানুষ আরও বেশি সচেতন হবেন। এছাড়া বর্জ্য সংগ্রাহকদের কীভাবে কোভিড বর্জ্য তুলবে, কোনগুলো কোথায় রাখবে তার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই শিক্ষা গ্রহণ করলে অনেক রোগ থেকে বাঁচতে পারে সমাজ। আর তা না হলে আখেরে বিপদ সবারই। নভেল করোনা ভাইরাস আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে এবং দিচ্ছে। এক্ষেত্রে বুঝিয়ে দিল স্বাস্থ্য কেবল হাসপাতালের শয্যা বাড়াবার এবং বেশি সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ করবার বিষয় নয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনারও বিষয়।

প্রায় এক দশক ধরে আমরা প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার জন্য সভা, সেমিনারে আলোচনা করে আসছি। করোনাকালে তা আর আমাদের মাথায় নেই। কোভিডের প্রায় সকল প্রকার সুরক্ষা সরঞ্জাম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি প্লাস্টিকও এক সমস্যা তৈরি করছে এবং তা দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত বিপত্তির দিকে এগোচ্ছে। সে কারণে প্লাস্টিকের তৈরি সুরক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে ভাবতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং হামের মতো রোগ থেকে প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে। ২০টিরও বেশি প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধের জন্য এখন ভ্যাকসিন রয়েছে। কোভিড-১৯কেও ভ্যাকসিন-প্রতিরোধযোগ্য রোগ হিসাবে পরিণত করার লক্ষ্যে অভূতপূর্ব গতিতে কাজ চলছে। বর্তমানে ২৬টি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন হিউম্যান ট্রায়ালের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং অন্তর্বর্তী বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা চলছে। যে তথ্যের বিশ্লেষণ সংস্থাকে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সন্ধান করতে সহায়তা করবে। ভ্যাকসিন নিয়ে রিপোর্ট ও স্টোরি ছাপতে কয়েক হাজার টন নিউজ প্রিন্ট ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে। গোটা দুনিয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছে। ভ্যাকসিনের গুরুত্ব আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এই সুবাদে কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন, কোভিভ্যাক্স বা ফাইজার, মডার্না, অ্যাস্ট্রোজেনেকা শব্দগুলোর সঙ্গে অনেকেই কম বেশি পরিচিত। ৩০ নভেম্বর 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট জানাচ্ছে ফাইজার, মডার্না, অ্যাস্ট্রেজেনেকা ২০২১-এ ৫.৩ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) ডোজ তৈরি করতে পারবে। বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন এই ভ্যাকসিন কতদিন সুরক্ষা দেবে। সুতরাং ভ্যাকসিন এলেও শুধু ভারত নয় পৃথিবীর অনেক মানুষই ২০২১-এ ভ্যাকসিন পাবে না। কোভিডের মতো অতিমারী খুব শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা ভুল হবে। বরং এই ভাইরাসের প্রকোপ আরও কিছুকাল স্থায়ী হবে। সেজন্য বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন কোভিড এখনই দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে না। কোভিড নিয়ে বহু প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত।

গত দু'দশকে ভ্যাকসিনের সাহায্যে মাত্র একটি মানব শরীরে সংক্রামক রোগকে নির্মূল করা গেছে। তা হল স্মল পক্স বা গুটি বসন্ত। ১৪ মে ১৭৯৬ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯-১৮২৩) ৮ বছর বয়সী জেমস ফিলিপ্স নামে একটি বালকের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সাফল্য পান। দু'বছর পর ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯ বিশ্বকে গুটি বসন্ত মুক্ত বলে ঘোষণা করে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় ১৯৮০-র মে মাসে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় কোভিড মুক্ত বিশ্ব কবে হবে তা অজানা। ফলে কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া, সুরক্ষা বিধি মেনে চলার পাশাপাশি কোভিড বর্জ্য নিয়েও সচেতন হতে হবে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ব্যক্তি, সংগঠন এবং রাষ্ট্র সবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবং অবশ্যই প্রয়োজন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। অভিজ্ঞতা বলছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব সংক্রমিত হয় প্রশাসনেও।

উমা

অনিবার্য কারণে 'আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি' এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল না।

স্ব চিকিৎসা — নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করুন

গৌতম মিস্ত্রী

সতর্কীকরণ: এই আলোচনা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পরিষেবার বিকল্প নয়। দ্বিমত অথবা সংশয় হলে অবশ্যই পেশাধারী চিকিৎসকের পরামর্শ অগ্রাধিকার পাবে। জনশিক্ষার এই প্রয়াস পেশাধারী চিকিৎসকের পরামর্শের বিকল্প নয়, পরিপূরক মাত্র।

প্রস্তাবনা : কোভিড-১৯-এর দৌলতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ রোগের চিকিৎসার কিছু কলাকৌশল শিখে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। জ্বর হলে সাধারণ মানুষ দেহের তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়ে মেপে নিতে পারবেন—এটা সমাজে চালুই ছিল। অনেকে আবার রক্তচাপ, রক্তের সুগার আর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মেপে নিচ্ছিলেন মাঝেমাঝে। থার্মোমিটারের ব্যবহারের সাথে সাথে রক্তচাপ, রক্তের সুগার নিজেই মেপে নেওয়া কাজের বলে চিকিৎসক-বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন ধরেই বলে আসছিলেন। রক্তচাপ ও রক্তের সুগার মাপার নির্ভরযোগ্য যন্ত্র এখনও থার্মোমিটারের মতো গ্রামেগঞ্জের মুদিখানা বা মনিহারি দোকানে সহজলভ্য নয়, তার দামও যথেষ্ট। তবে কিনা চাঁদা তুলে অথবা পাড়ার ক্লাবের উদ্যোগে একটা রক্তচাপ মাপার 'ডিজিটাল' যন্ত্র ও একটি রক্তের সুগার মাপার যন্ত্র কিনে অনেকে মিলে সেটা ব্যবহার করতেই পারেন। এই যন্ত্রগুলোর এক একটার বর্তমান দাম আড়াই হাজার টাকার মতো। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের জন্য খরচ প্রতি মাসে চারটে পেন্সিল সাইজের (এএ) ব্যাটারি। রক্তের সুগার মাপার জন্য প্রতিটা পরীক্ষার জন্য একটি করে রাসায়নিক মাখানো একবারের জন্য ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের শলাকা (চলতি কথায় 'স্ট্রিপ') লাগে যার প্রতিটার মূল্য ২০-২৫ টাকা। এইরকম এক একটা যন্ত্র অনেকে মিলে কেনা যেতেই পারে। রক্তের সুগারের মাত্রা মাপলে প্রত্যেকের জন্য এক ফোঁটা রক্ত বার করার জন্য একটা করে আঙ্গুলে ফোটানোর পিন (ল্যান্সেট) বা বিকল্প হিসাবে ইনজেকশনের সূঁচ লাগে। অর্থাৎ একটা রক্তের সুগারের মাত্রা নির্ণয়ের যন্ত্র, যার পরিচিত নাম গ্লুকোমিটার, সেটা বারোয়ারি হলেও প্রত্যেকের জন্য একাধিকবার ব্যবহারের উপযোগী একটা ল্যান্সেট ও প্রত্যেকবার পরীক্ষার জন্য একটা করে টেস্ট স্ট্রিপ লাগে। একটা প্যাকেটে ১০, ২৫ অথবা ৫০টা করে টেস্ট স্ট্রিপ থাকে আর প্যাকেটের সিল খুললে সেটা তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার করে নিতে হয়। এইজন্য টেস্ট স্ট্রিপের প্যাকেট বা শিশি বারোয়ারিভাবে কেনা যেতে পারে। কোন সদস্য কতবার পরীক্ষা করছেন, সেইমতো চাঁদা তুলে সবাই মিলে সেই টেস্ট স্ট্রিপের শিশি কিনে নিতে পারেন। ল্যাবরেটরিতে রক্তের সুগার পরীক্ষার জন্য ৭০ থেকে ১৫০ টাকা লাগে, তার সাথে বাড়ি থেকে ল্যাবরেটরিতে অন্তত দু'বার যাওয়া-আসার খরচটা যোগ করতে হবে— একবার রক্তের নমুনা দেওয়ার জন্য আর দ্বিতীয়বার রিপোর্ট আনার জন্য। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রুগীদের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরির রিপোর্টের চেয়ে বাড়িতে আঙ্গুলে পিন ফুটিয়ে একফোঁটা রক্ত বের করে 'ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ (CBG)' বা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন যন্ত্রে মাপা রক্তের সুগারের মাত্রা বেশি কাজের বলে বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত।

পর্ব ১— আমরা প্রথমে 'ডিজিটাল' যন্ত্র ব্যবহার করে সঠিক রক্তচাপ নির্ণয়ের কথা আলোচনা করব।

এই আলোচনায় জেনে নিই, উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে হবে হৃদরোগ, মস্তিষ্কের স্ট্রোক, কিডনি, অকেজো হয়ে যাওয়ার রোগ আটকানোর জন্য। যদিও প্রাথমিক স্কুলের বয়সে শিশুর অভিভাবক এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যদি অধিক সচেতন হয়ে শিশুকে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীতে, অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর খাবার ও স্বাস্থ্যকর বিনোদনে শিক্ষিত করে দিতে পারেন, তবে পরিণত বয়সে তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ হবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটা এখনও একটা স্বপ্ন মাত্র, তাই এখনও উচ্চ রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসা প্রাসঙ্গিক। সফল রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষকে আজ নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ নিশ্চিত করার মাপজোকের কলাকৌশল শিখে নিতে হচ্ছে। এইক্ষণে আমাদের পরিবারে, পাড়ায়, সমাজে উচ্চ রক্তচাপ একটি উল্লেখযোগ্য রোগ। এর নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় নিয়মিত রক্তচাপ মাপার প্রয়োজন সফল চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে আর ডাক্তারের কাছে

কত ঘনঘন আর যাওয়া যায়! ডাক্তারের কাছে গেলে ভয়েই খানিকটা রক্তচাপ বেড়ে যায় বলে যে আশঙ্কা, সেটা মোটেই হেলাফেলার নয়। ডাক্তারের মাপা রক্তচাপ যখন ঘরোয়া পরিবেশে নিজের মাপা রক্তচাপের চেয়ে বেশি হয় তখন সেই অবস্থাকে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন বলে। এটা চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বীকার করে ও সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের মাপা উচ্চ রক্তচাপ বেঠিক বলে বিবেচিত হয়। ডাক্তার বেশ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কম কথা বলেন। দেখলেই বুক দুরুদুরু করে, আমরা শীতকালেও ঘেমে যাই, রক্তচাপও বেড়ে যায়। পাড়ার দোকানে আগের দিনই রক্তচাপ মাপা হয়েছিল ১০ টাকা খরচ করে। রক্তচাপ মেপে ওষুধের দোকানদার, হাফ-প্যান্টের বয়সে দেখা হারু বলল, দাদা আপনার প্রেশার বেশ কম। ডাক্তারবাবুকে বলবেন কিছু ওষুধ কমিয়ে দিতে। কিন্তু এ কী হল? ডাক্তার ঝটিতে রক্তচাপ মেপে বললেন, কী করেছেন? ওষুধ খাচ্ছেন তো? এত বেশি কেন আপনার প্রেশার? এবার দেখছি ওষুধ বাড়াতে হবে। এইখানে ওষুধ বাড়ানোর আগে সঠিক রক্তচাপ মাপার অন্য উপায়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এটাই হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন— এটার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। সেটা পরে করা যাবে।

রক্তচাপ মাপা যখন এতটাই চাপের, মানে উৎকণ্ঠার তখন রক্তচাপ মাপার উপায়কে বিচারের কাঠগড়ায় খাড়া করা যেতেই পারে। সাইকেল, রিক্সা, স্কুটার অথবা চারচাকার গাড়ির চাকার প্রেশার মাপা এতটা হাঙ্গামার নয়। মাসে এক বা দু'বার মেপে নিয়ে হাওয়া দিয়ে গাড়ির চাকার প্রেশার বজায় রাখা ততটা খরচের নয়। তেমনি নিজেই নিজের রক্তের চাপ মেপে নেওয়া কেবল সবচেয়ে সস্তাই নয়, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যও বটে।

রক্তচাপ মাপার উপায়— কোভিডের দৌলতে পালস্ অক্সিমিটারের সাথে সাথে রক্তচাপ মাপার ডিজিটাল যন্ত্রও বেশ বিকোচ্ছে। ঘরে থার্মোমিটার না থাকলেও নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ঢুকে পড়ে ও তার ঘন ঘন ব্যবহার বেড়ে যায়। নিজের ঘরে না থাকলেও প্রতিবেশীর কাছ থেকে যন্ত্র ধার করে রক্তের চাপ মেপে নেওয়াই যায়। কোভিডের আগেও এই যন্ত্রটা কিছু কিছু সচ্ছল মানুষের কাছে ছিল, তবে সঙ্গত কারণেই করোনাকালে এটার ব্যবহার বেড়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে রুগ্ন মানুষ যেমন যেতে দ্বিধা করছেন, ডাক্তাররাও আতঙ্কে চিকিৎসাটা অনলাইনে সেরে নিচ্ছেন। এতাবস্থায় রোগীকে ঘরেই রক্তচাপ মেপে নিতে হচ্ছে। আমেরিকা-ইউরোপে অবশ্য রক্তের সুগার মাপার মতোই রক্তচাপ ঘরেই মেপে নেবার নিদান দিচ্ছেন চিকিৎসক মহল। কারণ অবশ্য অন্য। রক্তচাপ মাপার জন্য চিকিৎসকের পরিষেবা দ্বারস্থ হওয়া একটা বাজে খরচ কেবলই নয়, ঘরে মাপা রক্তের চাপ মাপার পদ্ধতি এখন বেশ উন্নত আর সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতালে অথবা চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ অনেক সময় কিছুটা বেড়ে যায় উৎকণ্ঠার কারণে। অচেনা ব্যক্তির সামনে রুগ্ন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই মানসিক চাপে থাকেন। এই চাপের ফলে ঘরোয়া পরিবেশের রক্তচাপ খানিকটা বেড়ে যায়— এটার গাল ভরা নাম 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন'। ডাক্তররা সাদা আলখাল্লার মতো অ্যাপ্রন বা কোট পরেন বলে অমন নাম। অর্থাৎ মানের দিক দিয়ে ঘরে মাপা রক্তচাপ চিকিৎসার প্রয়োজনে অধিক কাম্য। তবে সে ক্ষেত্রে রক্তচাপ মাপার সঠিক পদ্ধতি রোগীকে শিখতে হবে। সাইকেল বা হারমোনিয়াম কেবল কিনলেই সেটা ব্যবহার করা যায় না— সাইকেল চালানো আর হারমোনিয়াম বাজানো শিখতে হয়। বিদেশে সাধারণ মানুষকে রক্তচাপ মাপার প্রশিক্ষণের কাজটা চিকিৎসক অথবা অন্য কোনও স্বাস্থকর্মী করেন। আমাদের দেশে তার চল নেই, সেই প্রয়োজনটাও সমাজ উপলব্ধি করে না।

ডিজিটাল যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ মাপার স্বীকৃত পদ্ধতি।

ক) যার রক্তচাপ মাপা হবে সেই মানুষটির প্রস্তুতি —১) রক্তচাপ মাপার আধঘণ্টা আগের থেকে ধূমপান, চা এবং কফি পানে বিরত থাকতে হবে। ২) মানুষটি একটি চেয়ারে চুপ করে উৎকণ্ঠারহিতভাবে হেলান দিয়ে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট বসে থাকবেন। পায়ের পাতা মাটিতে আরামদায়কভাবে পাতা থাকবে। মোবাইল অথবা টেলিভিশন চোখের সামনে থাকবে না। ৩) চেয়ারে বসার আগে আবশ্যিকভাবে টয়লেটে গিয়ে মূত্রত্যাগ করে আসবেন। ৪) যে মানুষটির রক্তচাপ মাপা হচ্ছে আর যিনি সেটা মাপছেন তাঁরা কেউই বাক্যালাপ করবেন না। বেশ কিছু স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র দিয়ে নিজেই নিজের রক্তচাপ মাপা যায়, দ্বিতীয় কোনও মানুষের সাহায্য লাগে না। ৫) চেয়ারে বসার আগে হাতাওয়ালা ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক খুলে হাতাবিহীন পোশাক পরে নিতে হবে। ৬) শুয়ে বা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রক্তচাপ মাপা চলবে না।

খ) সঠিকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার — ১) সবার আগে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রটির কর্মক্ষমতা একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্রের

সাথে তুলনা করে বিচার করে ব্যবহারের উপযুক্ত বলে অনুমোদন করে নিতে হবে। ২) যার রক্তচাপ মাপা হচ্ছে, তার হাত (সাধারণত ডান হাত) চেয়ারের হাতলে বা টেবিলে আরামযোগ্যভাবে রাখতে হবে। ৩) রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের একটি অংশ, যাকে 'কাফ' বলে, সেটা বাহুতে সঠিকভাবে আবৃত করতে হয়। এটা একটা ভেলক্রো দেওয়া আবরণ, যেটা বাহুকে আবৃত করে আর তার মধ্যে রবারের একটি বেলুনকে তার চাপ বাড়া-কমা করতে দেয়। এটাই কাফ। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র চালু হলে কাফের মধ্যের বেলুনের চাপ বাড়া-কমা করে হাতের রক্তনালীর মধ্যের রক্তের চলাচলের বিভিন্ন সময়ের রক্তচাপ জেনে নিয়ে রক্তচাপের দুটো সংখ্যা (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক) আর হৃদস্পন্দনের হার বা পালস রেট যন্ত্রের ডিসপ্লেতে জানিয়ে দেয়। এই কাফটা ডান হাতের (ডান হাত না থাকলে বিকল্পে বাম হাতে) মাঝখানে (কনুই আর কাঁধের মাঝে) লাগাতে হবে। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রটা রাখতে হবে হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়ের (রাইট ভেন্ট্রিকল) উচ্চতায়। ৪) সঠিক মাপের কাফ অর্থাৎ বাহু-আবরণের মাপ বেছে নিতে হবে, যাতে আবরণের মধ্যের রবারের বেলুন বাহুর পরিসীমার অন্তত ৮০ শতাংশ আবৃত করে। বড় বা ছোট মাপের কাফ সঠিক রক্তচাপ নির্ণয় করতে পারে না। ৫) অন্তত একবার দুই বাহুতে রক্তচাপ নির্ণয় করে দেখে নিতে হবে দুই হাতে নির্ণীত রক্তচাপের পার্থক্য ২০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপের চেয়ে কম কিনা। এমনটি হলে সর্বোচ্চ নির্ণীত রক্তচাপ গৃহীত হবে। দুই হাতে নির্ণীত রক্তচাপের পার্থক্য ২০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপের চেয়ে বেশি হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে কোনও হাতের প্রধান রক্তনালীর সরু হয়ে যাবার রোগ আছে কিনা সেটা নির্ণয় করতে।

গ) রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য সঠিক রক্তচাপ মাপতে হবে — ১) অন্তত প্রথমবার ডান ও বাম বাহুতে রক্তচাপ মাপতে হবে। যে হাতে সর্বোচ্চ রক্তচাপ নির্ণীত হবে সেটাই চিকিৎসার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে ও রোগীর এই বৈশিষ্ট্যটা মনে রাখবার জন্য এই তথ্যটি মনে রাখতে হবে ও নথিভুক্ত করতে হবে। ২) একাধিকবার রক্তচাপ মাপার জন্য দুইবার মাপামাপির মধ্যে ন্যূনতম পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে। ৩) সঠিক পদ্ধতিতে রক্তচাপ কেবল একবার মাপলেই হবে না। বিস্তর ফারাক না হওয়া রক্তচাপের সংখ্যা অন্তত তিনবার মেপে রক্তচাপের দুটো (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক) সংখ্যার প্রত্যেকটার গড় করে সেটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তারিখ ও সময় উল্লেখ করে সেটা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র সঠিকভাবে রক্তচাপ নির্ণয় করতে পারে না। নাড়ির গতি অত্যন্ত দ্রুত হলে (মিনিটে ১৫০ বা তার বেশি) বা ছন্দপতনের রোগে হৃদ্‌স্পন্দন অনিয়মিত হলে (এরিদ্‌মিয়া, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, বেশি পরিমাণের এক্টোপিক বিট) ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র হাত তুলে দিয়ে বলে এটা আমাকে শেখানো হয়নি, অর্থাৎ যন্ত্রের ডিসপ্লেতে 'এরর মেসেজ'। বিশ্বস্ত যন্ত্র ভুল করে ভেজাল তথ্য পরিবেশন করে না। এইরকম ক্ষেত্রে এখনও প্রথাগত স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপার উপায় প্রাসঙ্গিক।

স্টেথোস্কোপ দিয়ে দিয়ে রক্তচাপ মাপার প্রথাগত পদ্ধতি— স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপার প্রথাগত পদ্ধতিতে কনুইয়ের ইঞ্চিখানেক উপরে বাহুতে উপরে বর্ণিত নিয়ম মেনে চাপ সৃষ্টিকারী 'কাফ' দিয়ে টাইট করে আবৃত করে নিতে হবে। তারপর একটা কাফ বেরিয়ে আসা একটা রবারের নলের প্রান্তে লাগানো একমুখী ভাল্বযুক্ত বাল্ব হাতে মুঠোয় চেপে চেপে কাফের মধ্যের রবারের বেলুনে হাওয়া ভরে কাফের প্রেশার বাড়াতে হবে। অন্য হাত দিয়ে ওই হাতের কব্জিতে নাড়ির স্পন্দনের ইঙ্গিতে মনোযোগ দিতে হবে। বাহুতে লাগানো কাফের প্রেশার ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার জন্য বাহুর প্রধান রক্তনালীর (ব্রাকিয়াল আর্টারি) অভ্যন্তরীণ সর্বোচ্চ চাপের বেশি হয়ে গেলে রক্তের প্রবাহ থেমে যাবে। তখন কব্জিতে রাখা অন্য হাতের আঙ্গুলে নাড়ির স্পন্দন আর অনুভূত হবে না। এই সময়ে যন্ত্রের প্রেশার নির্দেশক ডায়ালে অথবা যন্ত্রভেদে পারদস্তম্ভের উচ্চতা দেখে কাফের মধ্যের চাপের সংখ্যাটা (পারদস্তম্ভের চাপের এককে, mm of Hg) মনে রাখতে হবে। এই সংখ্যায় সিস্টোলিক অর্থাৎ রক্তচাপের উপরের সংখ্যাটার নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। হাতের মুঠোয় ধরা বাল্ব পাম্প করে কাফের চাপ আরও ২০-৩০ মিলিমিটার (যন্ত্রে পারদস্তম্ভের উচ্চতা) বাড়িয়ে নিয়ে কনুইয়ের সামনে আগের থেকে ব্রাকিয়াল আর্টারির স্থান নির্ণয় করে রাখা অংশে স্টেথোস্কোপের 'বেল' বা শব্দ শোনার যন্ত্রাংশ হাল্কা করে রেখে কানে স্টেথোস্কোপের গোঁজার দুটো যন্ত্রাংশ ঢুকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে (প্রতি সেকেন্ডে পারদস্তম্ভের চাপের এককে ২ মিলিমিটার করে) 'কাফের' হাওয়ায় চাপ কমাতে হবে। শুরুতে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের

কাফের চাপ রক্তচাপের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে কনুইয়ের সামনের প্রধান ধমনির রক্তস্রোত বন্ধ থাকবে। কাফের চাপ ক্রমাগত কমতে থাকতে থাকতে একসময় এর চাপ যখন রক্তচাপের সর্বাধিক (সিস্টোলিক) চাপের চেয়ে কম হবে তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত কনুইয়ের সামনের প্রধান ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত থাকবে ও কাফ দিয়ে সংকুচিত হয়ে যাওয়া ধমনির ঠিক নীচে রক্ত প্রবাহে একটা তোড় (টারবিউলেন্স) তৈরি হবে। এটা নাড়ির গতির ছন্দে 'ঠুকঠুক' করে শব্দ সৃষ্টি করবে। রক্ত প্রবাহের এই তোড়ের শব্দ স্টেথোস্কোপের কানে গোঁজার দুটো যন্ত্রাংশ দিয়ে সোনা যাবে। ঠিক এই সময় কব্জিতে আবার নাড়ির স্পন্দন অনুভূত হওয়া শুরু হয়ে যাবে। যে মুহূর্তে এই শব্দ প্রথম শোনা যাবে সেটা রক্তের সিস্টোলিক প্রেশার। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের চাপ কমানোর চাবি নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্রের কাফের চাপ ক্রমশ কমাতে থাকলে একসময় এই চাপ রক্ত প্রবাহের সর্বনিম্ন চাপের চেয়েও কমে যাবে আর রক্তনালীতে কোনও চাপ না থাকায় রক্ত প্রবাহে তোড় (টারবিউলেন্স) তৈরি হবে না, কোনও শব্দও স্টেথোস্কোপে শোনা যাবে না। এই সময়ের চাপ হল ডায়াস্টোলিক প্রেশার। সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক প্রেশার রক্তচাপ মাপার যন্ত্রে দেখে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

স্টেথোস্কোপের সাহায্যে এই রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি সর্বোত্তম হলেও এটা প্রশিক্ষণ করার একটা পর্যায় থাকে। ডাক্তারদের প্রশিক্ষণে এটা রপ্ত করতে ছয় মাস লেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের জন্য সহজে নির্ভরযোগ্যভাবে রক্তচাপ মাপার জন্য তাই 'ডিজিটাল' রক্তচাপ মাপার আধুনিক যন্ত্র জনপ্রিয়। সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে কেবল সঠিকভাবে যন্ত্রের 'কাফ'টা পরে নিতে হয়। কাফে হাওয়া ভরা তারপরে নিয়ন্ত্রিতভাবে হাওয়া কমিয়ে চাপ কমিয়ে স্টেথোস্কোপের শোনার কাজটাও যন্ত্র নির্ভুলভাবে করতে সক্ষম। কেবল শিখে নিতে হয়, কিভাবে আর বাহুর কোথায় কাফটা বাঁধতে হবে। এই যন্ত্রে রক্তের স্রোতের তোড় নির্ণয় করার জন্য একটা যন্ত্রাংশ (সেন্সর) থাকে, যেটাকে ব্রাকিয়াল ধমনির উপরে রাখতে হয়।

আমাদের দেশে এই সময় যে ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র শহর আর গ্রামেগঞ্জে দেদার বিক্তি হচ্ছে, সেটা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কিনেও নিচ্ছেন। এই যন্ত্রের কাফ বাহুতে বাঁধার কৌশলটা অনেকটা সহজ। ক্রয়ক্ষমতা আর প্রশিক্ষণের কথা মনে রেখে আর রক্তচাপ মাপার সবকটা বৈশিষ্ট্য মেনে সঠিকভাবে রক্তের চাপ মাপা দরকার। রক্তচাপ মাপার প্রশিক্ষণ তো দূরের কথা, যেন-তেন-প্রকারে রক্তচাপ মেপে সেটা ব্যবহার করলে সবসময় যে সুখের হয় না সেটা বুঝে নিতে পারলেই সঠিক রক্তচাপ মাপার প্রয়োজন ও হুজুগ আমাদের ক্ষতি করবে না।

হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন — ধরুন আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন আর আপনার বাড়িতে বসে নিজের মাপা রক্তচাপের সঙ্গে চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ একদম মিলছে না। আপনি তখন হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছেন, আপনি যথেষ্ট যত্নসহকারে রক্তচাপ মেপেছেন বেশ কয়েকবার। এ ক্ষেত্রে কী করা?

চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ অনেক সময়েই বাড়ির উৎকণ্ঠামুক্ত পরিচিত পরিমণ্ডলে মাপা রক্তচাপের মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়। এটাকে 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন' বলে থাকেন বিশেষজ্ঞ মানুষ। ডাক্তারদের পরা প্রথাগত সাদা রঙের কোট বা অ্যাপ্রন দেখে রোগীর রক্তচাপ বেড়ে যায় বলে আধুনিক ডাক্তাররা আজকাল আর বিশেষ আলখাল্লা পরেন না, ক্যাজুয়াল পোশাক পরেন। তবুও রক্তচাপ, নাড়ির গতি আর অজানা ভয় রোগীকে আবিষ্ট যে করে না, তেমনটা বলা যাবে না।

বিকল্প হিসাবে থাকছে রোগী নিজে বাড়ির পরিচিত পরিবেশে রক্তচাপ মেপে নিয়ে আসবেন হাসপাতালে তার চিকিৎসার জন্য। স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপা শেখার জন্য প্রশিক্ষণ আর অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। তাই বাজারে এল 'ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র'। এগুলো নির্ভুলভাবেই রক্তচাপ মাপে, তবে ন্যূনতম প্রশিক্ষণের দরকার হয় এই যন্ত্রের ব্যবহারেও। চিকিৎসক তার ব্যস্ত কাজের অঙ্গ হিসাবে রোগী/সুস্থ মানুষকে শিখিয়ে দিতে পারেন বাহুর কোথায় কিভাবে ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ বাঁধতে হবে। এটাও বলে দেবেন, রক্তচাপ মাপার আগের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি।

রোগী বা সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে রক্তচাপ মাপতে পারলেন কিনা সেই সংশয়ও অনেক সময়ে থেকে যায়। এই সংশয়ের সমাধানে আর একটা যন্ত্র উদ্ভাবন হয়ে গেছে, যেটা হল ২৪ ঘণ্টা ধরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের প্রয়োগ (Ambulatory Blood Pressure Monitoring, ABPM)। বাহুতে এই যন্ত্র বেঁধে রোগী বা সুস্থ মানুষ একদিন কাটান— কেবল স্নান করা চলে না। যন্ত্র একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর উদাহরণস্বরূপ দিনের বেলা ৩০ মিনিট অন্তর ও রাতের

বেলা ৬০ মিনিট অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তচাপ মেপে যন্ত্রে জমা করে রাখে। কম্পিউটার সেটার বিশ্লেষণ করে ২৪ ঘণ্টায় রক্তচাপের সংখ্যা ও তার গড় জানিয়ে দেয়। চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ, রোগীর নিজের বাড়িতে নিজের মাপা রক্তচাপ ও সারাদিন ধরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের মাপা রক্তচাপের মধ্যে একটা সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করেছেন।

সবশেষে এটা উল্লেখ না করলে অন্যায্য হবে, রক্তচাপের সংখ্যা একটা সংখ্যা মাত্র। যেভাবেই মাপা হোক না কেন, স্বাস্থ্যকর রক্তচাপের সংখ্যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অন্তিম লক্ষ্য। এই চিকিৎসার উপরেই নির্ভর করে চিকিৎসিত ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতা। সঠিকভাবে রক্তচাপ মাপা তাই একান্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র : চিকিৎসকের মাপা, ডিজিটাল যন্ত্রের দ্বারা রোগী বা সুস্থ মানুষের নিজের মাপা ও সারাদিনের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের মাপা রক্তচাপের পারস্পরিক সম্পর্ক :

Reproduced from: Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines. J Am Coll Cardiol 2017.

উমা

অবলুপ্ত তিনটে বাংলা বই

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

প্রশ্ন উঠতে পারে, অবলুপ্ত বইগুলো কী কী? এই বইগুলোর গুরুত্বই বা কেন? অধুনা অবলুপ্ত বইগুলো হল — ১) ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের লন্ডন ফার্মাকোপিয়া (১৮৪৯), ২) ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের (আর. জি. কর) ভৈষজ্য রত্নাবলী (১৮৯০) এবং ৩) ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের (আর. জি. কর) সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব (১৮৯৩)। নামেই মালুম, এই বইগুলো ঠিক সাধারণের পাঠযোগ্য নয়, বরঞ্চ এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য এই বইগুলো লেখা হয়েছিল; হ্যাঁ, যাঁরা ভবিষ্যতে ডাক্তারি বিষয়টাকে পেশা হিসাবে নেবেন সেইসব দেশীয় লোকদের কথা ভেবে— যাঁদের 'নেটিভ ডাক্তার' বলে তকমা দেওয়া হত, তাঁদের বোঝা ও বোঝানোর সুবিধার জন্য এই বইগুলো লেখা হয়েছিল। যেমন 'সংক্ষিপ্ত শারীর তত্ত্ব'-র ভূমিকায় ডাক্তার কর লেখেন, ''বঙ্গভাষায় শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের অসদ্ভাব আছে। সেই অভাব মোচনার্থে এই 'সংক্ষিপ্ত শারীর তত্ত্ব' প্রকাশিত হইল।''

কিন্তু কেন এই উদ্যোগ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের ১৭৫৭ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু ঘটনার দিকে নজর দিতে হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৪ সালে ভারতে অবস্থিত ইউরোপিয়ানদের চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস (IMS) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সাহেব ডাক্তারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। এছাড়াও পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রচার এবং প্রসারের একটা উদ্দেশ্য সরকার বাহাদুরের ছিল। শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসাই না, পাশাপাশি ইংরাজি শিক্ষা এবং ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্য নিয়েও ইংরেজরা এগোচ্ছিল। এসব কারণেই বাংলার কলকাতা প্রেসিডেন্সিতে সামরিক এবং বেসামরিক ক্ষেত্রে দেশীয় ডাক্তার নিয়োগের একটা চিন্তাভাবনা কোম্পনি করতে শুরু করে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং দেশীয় ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'The Native Medical Institution' নামের একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। সরকার-পোষিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, একই সাথে পাশ্চাত্য এবং দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলন। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। মাত্র ১৩ বছর এই প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব ছিল এবং ১৮৩৫ সালে Native Medical Institution-র অবলুপ্তি ঘটে। এর সাথে সাথে দেশীয় চিকিৎসার (প্রধানত আয়ুর্বেদিক) প্রতি সরকারের যে মনোভাব অর্থাৎ দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে তাকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা, সেটাও শেষ হয়। বরঞ্চ সরকার আরও বেশি করে পশ্চিমি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অন্য নীতি গ্রহণ

করল। এই ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কমিটি একটা মেডিকেল কলেজ গঠন করার প্রস্তাব করেন। এবং সেই প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে পুরোপুরি পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থা শেখানোর উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি বরাদ্দ নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনকে না দিয়ে মেডিকেল কলেজকে দেওয়া শুরু হয়। আর সেখানেও দেশীয় ডাক্তার তৈরি করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সম্পূর্ণ বেসরকারি একটা উদ্যোগ নেওয়া হয় মাতৃভাষায় শিক্ষিত দেশীয় ডাক্তার তৈরির। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের উদ্যোগে ১৮৮৭ সালে ৮জন ছাত্র নিয়ে ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। এটি ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখার জায়গা। এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার পথ সুগম করা যাতে হাতুড়ে চিকিৎসকের সংখ্যা কমে দেশীয় চিকিৎসার গবেষণাভিত্তিক অনুশীলন হয়। অর্থের অভাবে ছাত্ররা প্রাথমকিভাবে মেয়ো ও চাঁদনি হাসপাতালে রোগী দেখতেন। ১৮৮৯-৯০ সাল নাগাদ এখানে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসক-শিক্ষকরা ছিলেন— ডা. রাধাগোবিন্দ কর, ডা. নীলরতন সরকার, ডা. সুন্দরীমোহন দাস, ডা. লালমাধব দাস প্রমুখ প্রথিতযশা ডাক্তাররা। শিক্ষকরাও যাতায়াতের খরচ ছাড়া আর কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না। ১৮৯৯ নাগাদ এখানে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ৬০০। এই স্কুল প্রসঙ্গে ডা. নীলরতন সরকার তাঁর বার্ষিক সভায় 'বঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসা ব্যবসায়' নামে এক বক্তৃতায় বলেন, ''আমাদের আশা হয় কলিকাতা মেডিকেল স্কুল কালে বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে শত শত সুশিক্ষিত চিকিৎসক প্রেরণ করে, আমাদের দেশের এই দুর্দশা দূর করতে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হবেন। এইভাবে আমরা হাতুড়ে নামক অদ্ভুত জীবদিগের ডাক্তারী বৃত্তি ছাড়াইতে সমর্থ হব।'' আমরা কি হাতুড়ে ডাক্তারদের গ্রাম থেকে তাড়াতে পেরেছি? শিক্ষিত চিকিৎসকরা শহরে চিকিৎসা করার ব্যাপারে লালায়িত, স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও বেশিরভাগ গ্রাম এখনও হাতুড়ে চিকিৎসকের ওপরই নির্ভরশীল। চিকিৎসকরা অনেকেই কলকাতা কেন্দ্রিক।

১৮৯৫ সালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের জায়গায় কলেজ অব ফিজিসিয়ানশ অ্যান্ড সার্জেন্টস্ অব বেঙ্গল একত্রিত হয়ে বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (যা বর্তমানে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিচিত) তৈরি করা হয় এবং ওই বছর থেকেই সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। এই প্রসঙ্গে ডা. নীলরতন সরকার বলেন— ''কোন জাতির প্রাণের দায়িত্ব অন্য জাতির হস্তে থাকা অনুচিত। নিজের দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার সেই দেশেরই লোকের হাতে থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেক সুফল পাওয়া যায়। ...গভর্ণমেণ্ট হয়ত উচ্চপদে বিদেশী নিয়োগই পছন্দ করেন এবং দেশের লোক নিজের হাতে কোনো কিছুর ভার লইলেই অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সহযোগিতা করিতে চান না।''

কাজেই সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে দেশীয় ভাষায় বা নির্দিষ্টভাবে বললে বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার একটা চল শুরু হয়েছিল। এর একটা বড় কারণ চিকিৎসক সংখ্যার অপ্রতুলতা। এইসব হবু ডাক্তারদের পঠনপাঠনের জন্য বাংলা ভাষায় লেখা বইয়ের প্রয়োজন পড়ল। আরও অনেক বই নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু আপাতত আমাদের হাতে এই তিনটে বই এসেছে। আমরা এবার এই বইগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। বলে রাখা ভাল, লেখক বিষয়বস্তুর বিশেষজ্ঞ নয়। কাজেই সে ব্যাপারে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে।

প্রথমে আলোচনা করা যাক, 'লন্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী' বইটি। ১৮৩৬ সালে বইটির ইংরাজি সংস্করণ সরকারের আদেশক্রমে বাংলায় অনুবাদ করেন ডা.

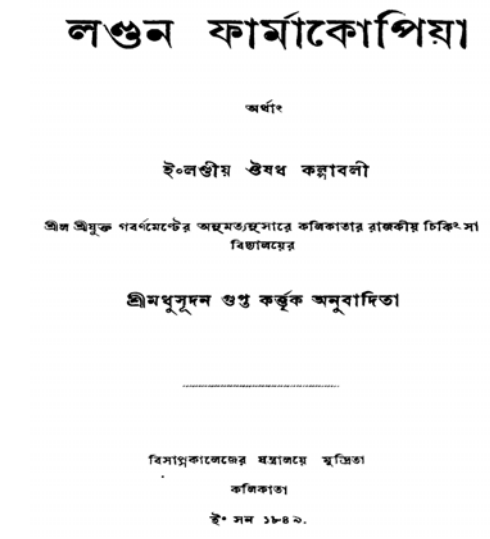

লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া

অর্থাৎ

ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী

শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের

শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিতা

বিসাপ্লকালেজের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা

কলিকাতা

ইং সন ১৮৪৯.

মধুসূদন গুপ্ত (ইনি ভারতের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী চিকিৎসক)। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বই প্রসঙ্গে ডা. গুপ্ত বলেন, ''শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে লান্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংরাজী ঔষধ কল্পাবলী সাধু বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদিতা ও মুদ্রিতা হইল। ...প্রত্যেক ঔষধের ইংরাজী ও ল্যাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি পশ্চাৎ ঐ সকলের নাম বঙ্গভাষাতেও লিখিয়াছি যে সকল ঔষধাদির নাম বঙ্গভাষাতেও নাই তাহা কল্পিত করিয়া অনায়াসে বোধগম্য যাহাতে হয় তাহা করিয়াছি ...'' (বানান অপরিবর্তিত) অনেক শব্দের কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নেই বলে ডা. গুপ্ত আক্ষেপও করেছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি ইংল্যান্ডের ট্রয়ওয়েট এবং ইম্পেরিয়াল মেজর পদ্ধতিতে ওজনের কথা বলেছেন, যার সাহায্যে ওষুধের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মাপবেন : অর্থাৎ গ্রেন, স্ক্রুপল, ড্রাম, আউন্স ও পাউন্ডে। যে পাত্রে ওষুধ রাখতে হবে সেই পাত্রও কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। অনুবাদের জন্য তিনি কিছু কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেগুলোর পারেন নি, সেগুলোর ল্যাটিন বা ইংরাজি নাম ব্যবহার করেছেন। কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল —

ল্যাটিন —অসিডা/অসিডম্ ক্যান্তারেডিস/অসিট্রা সিল্লী/ ওলিয়ম ইথিরিয়ম/অকানিটেনা

ইংরাজি — অসিডস/ বিনিগর আব ক্যান্থারেডিস/বিনিগর আব স্কুইল্‌কন্দরা/ ইথীরিয়েল্/অকানিটেনা

বাংলা — অম্ল অথবা দ্রাবক/ তেলনী মক্ষিকামিশ্র সির্কা/ মিশ্র সির্কা/আইল/কাটবিষের পালো। ইত্যাদি

২৪৫ পাতার এই বইয়ে কিভাবে এইসব রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করতে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

'মেটেরিয়া মেডিকা'-র বাংলা সংস্করণ হিসাবে রাধাগোবিন্দ করে 'ভৈষজ্য রত্নাবলী' এরকম আরেকটি গ্রন্থ। ৮২৬ পাতার বিপুল এই বইটি দেখা যাচ্ছে একাদশ সংস্করণ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। মূল সংকলনটি অবশ্য দুর্গাদাস কর মশাই করেছেন। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ডা. দুর্গাদাস কর লেখেন, ''কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজস্থ বাঙ্গালা শ্রেণীর পাঠ্যপযোগী প্রায় কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়করূপে বিরচিত বা অনুবাদিত হয় নাই, তন্নিবন্ধন ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। ...ছাত্রবর্গের বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়া, স্বীয় উপদেশ্যবিষয়ে ঐ কষ্ট নিবারণ অভিপ্রায়ে, বিবিধ ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'ভৈষজ্য রত্নাবলী' নামক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম।'' একাদশ সংস্করণে ডা. রাধাগোবিন্দ কর আরও কিছু যোগ করেছেন। ২৬ পরিচ্ছদের এই বইটিতে বিভিন্ন রোগ এবং তার চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধের কথা এখানে বর্ণিত আছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দ্বাদশ অধ্যায়ের বিষয় — এক্সপেক্টোরেন্টস্ বা কফনিঃসারক ঔষধ।

১ম কফনিঃসারক

ল্যাটিন : বাল্‌সেমম্ পিরুবিয়ানম্ বালসাম্ অব্ পিরু

ইংরাজি: (Balsamum Peruvianum) (Balsum of Peru)

লিগিউমিনেসি জাতীয় মাইরক্সাইলন্ পেরেরি নামক বৃক্ষের রস। বৃক্ষের স্কন্ধে অস্ত্রাঘাত করিলে নির্গত হয়।

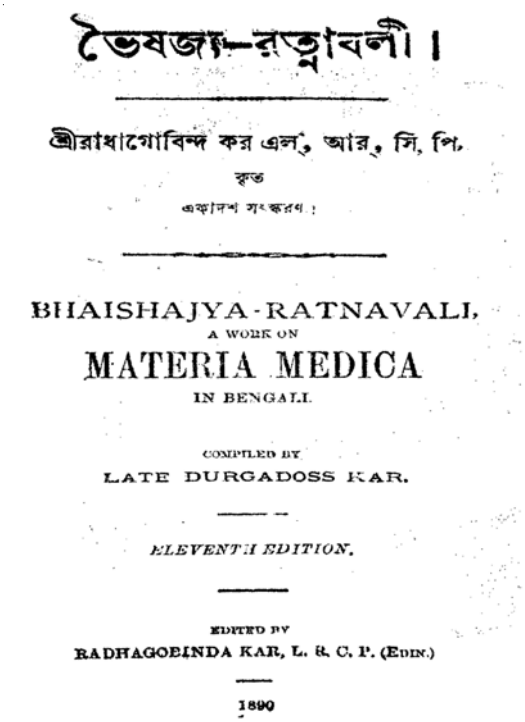
ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

শ্রীরাধাগোবিন্দ কর এল্, আর্, সি, পি,

কৃত

একাদশ সংস্করণ।

BHAISHAJYA-RATNAVALI,

A WORK ON

MATERIA MEDICA

IN BENGALI.

COMPILED BY

LATE DURGADOSS KAR.

ELEVENTH EDITION.

EDITED BY

RADHAGOBINDA KAR, L. S. C. P. (EDIN.)

1890

মার্কিন্‌খণ্ডে সাল্‌বেডর দেশে জন্মে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব — ঘোর পাটলবর্ণ, ঈষৎ স্বচ্ছ, দেখিতে রাবণ্ডড়ের ন্যায়, বিশেষ উগ্র সদগন্ধযুক্ত, রুক্ষ এবং কটু আস্বাদ, অগ্নিদাহ্য, সুরাতে দ্রবণীয়, ইহাতে বারি তৈল, ধুনা এবং সিনামিক্ এসিড্ নামক দ্রব্যবিশেষ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া— উত্তেজক, কফ নিঃসারক, এ ভিন্‌ন, প্রায় সমুদায় শৈষ্মিক ঝিল্লিকে উত্তেজিত করে। বাহ্য প্রয়োগে ঈষৎ উত্তেজক।

আময়িক প্রয়োগ। পুরাতন শ্বাসনালী প্রদাহ শ্বাসকাস এবং অন্যান্য প্রকার কাস রোগে উত্তেজক এবং কফনিঃসারক হইয়া উপকার করে। স্কুইল, গঁদ এবং সিরপ্ অব্ পপিজ্ সহযোগে বথ্যবস্থেয়। অপর, ইহা ধূম শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে কাসের উগ্রতা দমন এবং কফ নিঃসরণ করিয়া উপকার করে। তরুণাবস্থায় নিষিদ্ধ।

পুরাতন ক্ষত, শয্যা-ক্ষত এবং পচা ক্ষতে ইহার স্থানিক প্রয়োগ করিলে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্যোন্মুখ হয়। কর্ণে পুয হইলে ডাং এন্টনি টড্ টম্প্সন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেন: বাল্সাম্ অব্ পিরু ১ ড্রাম, বৃষপিত্ত ২ ড্রাম। মিশ্রিত করিয়া কর্ণকুহরে প্রয়োগ করিবে।

চিল্ব্লেন বা পাঁকুই রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা মহোপারক— বাল্সাম্ অব্ পিরু ।।০ ড্রাং স্পিঃ ভাইনাই রেক্টি : ১।।০ আং ডাইল্যুটেড্ হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ ।।০ ড্রাং টিং বেন্জোইন্ কো ।।০ আং একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনরূপে রোগস্থানের উপরত্বক ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রযোজ্য। চুচুক-বিদারণ ও চুচুক-ক্ষতে ইহার মলম (।।০ ড্রাং বসা ১ আং) স্থানিক প্রয়োগে উপকারক। ওষ্ঠ-বিদারণ ও হস্ত-ফাট রোগেও এই মলম উপযোগিতার শিত ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা। ১০ মিনিম্ হইতে ।।০ ড্রাম পর্যন্ত।

এই ধরনের বিভিন্ন ওষুধের প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে তা বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। ডাক্তারদের গভীরভাবে অনুসন্ধান করে ওষুধের মাত্রা ঠিক করতে হত। এখন তো নিজের চোখ না যন্ত্রের চোখের ওপর বেশি নির্ভরশীল।

তৃতীয় বইটি রাধাগোবিন্দ করের 'সংক্ষিপ্ত শারীর-তত্ত্ব'। ৮২২ পাতার এই বইটিতে মানব শরীরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। বইটির শুরু হয়েছে এইভাবে— এনাটমি— এই কথাটী দুইটি গ্রীক্ শব্দ হইতে উৎপন্ন — এনা= সমগ্র রূপে বা আদ্যোপান্ত, টেম্নিন্= কর্ত্তন করণ। প্রকৃত অর্থে ইহা ব্যবচ্ছেদ বুঝায়; সাধারণতঃ যে বিজ্ঞানবলে জীবদেহের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে এনাটমি বলে। শরীর কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত এবং শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ অবয়ব আদি কি প্রকার ও কিসের দ্বারা সম্মিলিত, যে বিদ্যার দ্বারা সেই জ্ঞান জন্মে তাহাকে এনাটমি বলে। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে শ্রেণীবিভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণী ধরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে গভীর আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এই আলোচনা? কেন তিনটে দুষ্প্রাপ্য বই নিয়ে এই লেখা? ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে স্বদেশ গড়ার কারিগরদের মনে হয়েছিল, দেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন জরুরি হবে। তখন বিজ্ঞান, কারিগরি, চিকিৎসাশাস্ত্রে দেশীয় ভাষায় মূল বইয়ের প্রয়োজন পড়বে। এই ধরনের কিছু পুরো বিষয়বস্তু নির্ভর বই যদি প্রাথমিকভাবে তৈরি করা যায় তাহলে তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আরও কিছু ভালো বই তৈরি হবে। যাতে পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটে। তাঁদের কাছে একটা ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল, বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যবর্ধক। কিন্তু বর্তমানে আমরা উল্টোটাই দেখছি। ইংরাজি শিক্ষার আগ্রাসনে বর্তমানে ভীষণভাবে দেশীয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিপন্ন। ইংরাজি না জানলে সে আদৌ শিক্ষিত কিনা, সেই বিষয়েই প্রশ্ন চিহ্ন পড়ে যায়। এ যেন আরেক ধরনের বিদেশী অনুপ্রবেশ। যে ধ্যানধারণায় ইংরেজ আমলের শিক্ষিত মানুষজন দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন সেখান থেকে আমরা অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে গেছি বলেই আমার ধারণা।

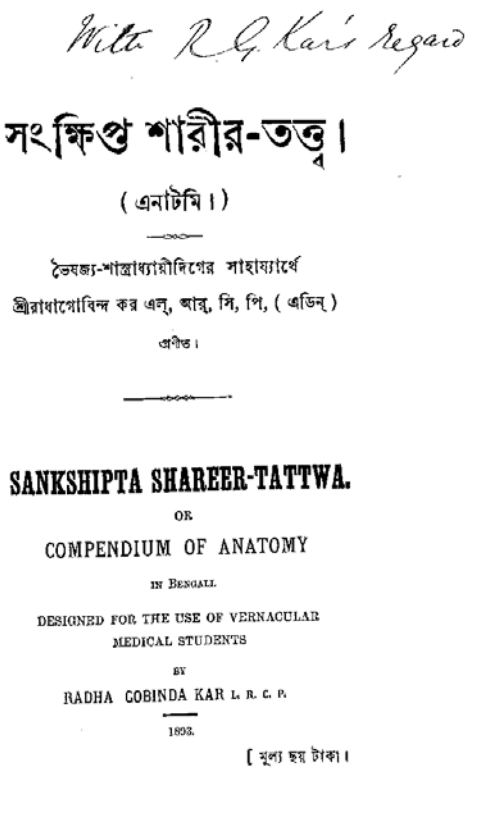
With R. G. Kar's Regard

সংক্ষিপ্ত শারীর-তত্ত্ব।

(এনাটমি।)

বৈদ্যজ্য-শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের সাহায্যার্থে

শ্রীরাধাগোবিন্দ কর এল্, আর্, সি, পি, (এডিন্)

প্রণীত।

SANKSHIPTA SHAREER-TATTWA.

OR

COMPENDIUM OF ANATOMY

IN BENGALI

DESIGNED FOR THE USE OF VERNACULAR MEDICAL STUDENTS

BY

RADHA GOBINDA KAR L. R. C. P.

1893.

[মূল্য ছয় টাকা।

উমা

প্রযুক্তি পেরিয়ে - ২

তারে-বেতারে

অমিত চৌধুরী

প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেও তার কত কিছুই অচেনা, অজানা থাকে আমাদের! ''বৈদ্যুতিক'' যন্ত্র বা ব্যবস্থা — এবং 'বৈদুতিন' যন্ত্র বা ব্যবস্থা ঘিরে আছে আজ — আধুনিক মানুষকে। এইসব প্রযুক্তি, মানুষকে কখনও শক্তিমান কখনও আরও বুদ্ধিমান করে তোলে। সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বেশি বেশি করে। এরই এক 'প্রমাণ' বা 'প্রকাশ' ঘরে-বাইরে 'তারে-বেতারে''। হাইওয়ে থেকে রেলপথে, শহরের রাস্তার ধারে বা গলির পাশে, কলকারখানা বা ঝাঁ-চকচকে অফিস থেকে বাড়ি-ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে একান্ত কোণে— কত রকমের তারের আনাগোনা, তা আমরা কতটুকু ভাবি? আবার বিশ্বজোড়া তারের ও বেতারের বহুস্তর, বহুমুখী ব্যবস্থা — কমপিউটার ও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির— আধুনিক সব ব্যবহারের বড় ভরসা। অদৃশ্য অথচ সর্বগ্রাসী ওয়েভ বা তরঙ্গ ঘিরে আছে আমাদের সর্বদা। কম্পাঙ্ক কখনও খুব কম, কখনও বাড়তে বাড়তে খুব বেশি। মেগা, কিলো বা মাইক্রোর হিসেব— বেতার ব্যবস্থার মাপজোক বোঝালেও এটা সত্য যে, কোনও বেতার তরঙ্গ ফোনকে ব্যস্ত রাখছে, কোনও বেতার তরঙ্গ টিভির রঙিন বিনোদনকে বিশ্বজুড়ে ছড়াচ্ছে আর কেই বা চুপিচুপি যুগিয়ে কম্পিউটারের বিশ্বদর্শন বাড়াচ্ছে ২৪ ঘণ্টা, ৩৬৫ দিন। তার খবর কে রাখে? উপগ্রহ থেকে আকাশ-পরিবহন, মিসাইল থেকে ড্রোন।

পুরনো দিনের রেডিও থেকে আধুনিকতম স্মার্ট ফোন— সবকিছুরই প্রাণভোমরা যে বেতার সংযোগের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার তা আমরা জানলেও সেই বেতার-প্রযুক্তির ভেতরের বিজ্ঞান দূরে থাক ভেতর ও বাইরের এরিয়াল, অ্যান্টেনা, টাওয়ার, ডিশ — যথাযথ পরিচিত, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! মূল প্রযুক্তিকে ঘিরে অথবা প্রযুক্তি পেরিয়ে, তারে-বেতারে যেভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে যাচ্ছি আমরা তা একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যাক।

ফ্ল্যাটের এক-একটি ঘরে আজকাল একাধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র এলোমেলোভাব থাকে। কেউ কম, কেউ বেশি ভোল্টেজে চলে। বেতার যন্ত্রেরও ছড়ানো-ছিটানো অবস্থা। হাতে-হাতে ফোন, ল্যাপটপ বা অভিনব কোনও বেতার খেলনা। বাড়ির বাইরে বিদ্যুতের খুঁটিকে পাক দিয়ে কেবল টিভি বা কেবল ইন্টারনেটের এদিক-ওদিক যাওয়া তার শুধু নয়, পাড়ার ক্লাবের পুজোর আলোক-সজ্জার — সস্তার তারের কত কারসাজি!

অপ্টিকাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ঘরে-বাইরে আজ এই ফাইবারের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বিদ্যুতের তারের ব্যবহার তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে উনিশ শতকের শেষে (১৮৮০-র পরে) আমেরিকায় দুই উদ্ভাবকের হাত ধরে। একজন 'বাল্ব' সহ ২০০০-এর বেশি ব্যবহারের পেটেন্ট নিয়েছেন। নাম টমাস এডিসন। ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি ছিল তাঁর তারের প্রবাহ। উল্টোদিকে নিকোলাস টেসলার উদ্ভাবন অল্টারনেটিভ কারেন্ট বা এসি। শীঘ্রই ডিসির বিপক্ষে দাঁড়াল। এসি-র পক্ষে ছিল সহজে বেশি বা বাম ভোল্টেজ বারার কেরামতি বা ট্রান্সফর্মারের ব্যবহার। আজ আবার অনেক ব্যবহারে ডিসি-র জনপ্রিয়তা ফিরে এসেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থেকে অতিদূরত্বে বিদ্যুত সরবরাহে ডিসি গুরুত্ব পাচ্ছে এই একুশ শতকে। বিদ্যুৎ-তারে যেমন বিদ্যুতের পরিবহন, তেমন তাকে ব্যবহার্য করতে নানাজাতের 'ইনসুলেশন' হল দরকারি। ডিজিটাল যোগাযোগের নানান তার কিন্তু, আরও নতুন নতুন নকশায় তৈরি হয়ে চলেছে। একেবারে অন্যভাবে তৈরি ফাইবার অপটিক তার। এরা সবাই আজ কিন্তু আমাদের প্রতিবেশি— ঘরে বাইরে। প্রযুক্তির ব্যবহারে এদেরকে জানা-বোঝা ও যত্ন করা অতি প্রয়োজনীয়।

উমা

প্রাপ্তি স্বীকার

চারদিকে যখন অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার, যুক্তিহীন চিন্তার বান ডেকে যাচ্ছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার হাতিয়ার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ না-ধার্মিক মানবতাবাদী মঞ্চ তাদের মুখপত্র 'মুক্তমন মুক্তচিন্তা' (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০, ১ম বর্ষ) প্রকাশ করে একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ করলেন। ৩২ পাতার পত্রিকা। দাম ৩০ টাকা। প্রতিটি নিবন্ধ মুক্তমন মুক্তচিন্তায় পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবে। পত্রিকার সম্পাদক লিখছেন, 'ধর্মীয় ভাবাবেগ, অন্ধবিশ্বাস---যুক্তিবর্জিত সংস্কার ও মেনে চলার ঐতিহ্যকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে আমরা বহন করি উত্তরাধিকারের মহান কর্তব্য বিবেচনায়'।

যোগাযোগ— গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ।

ফোন-৯০৬৪৭৫৭৬৮৪

ই-মেল: noreligion2019@gmail.com

চিঠিপত্র

(১)

উৎস মানুষ ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে একাদশবর্ষ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছে জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সংখ্যায়। বক্তা — ডাক্তার গৌতম মিস্ত্রী। বিষয় ছিল: প্রযুক্তি যতই থাক, নাড়ি টেপা ডাক্তারি হেলাফেলার জিনিস নয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি এগোবেই। সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই কাম্য। এ দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে একটা অবস্থান আমাদের খোঁজা দরকার। ডাক্তারবাবু ডাক্তারি পাশ করে ১৯৮২ সালে যখন ইন্টার্নশিপ করছেন তখন মেডিকেল কলেজের একমাত্র ইসিজি মেশিনটি বিগড়ে গেল। বিভাগীয় প্রধানকে সেটা জানালে তিনি বললেন, ইসিজি ছাড়াও হার্টের রোগের চিকিৎসা করা যায়। সেটুকু কর। সেটা এক ধরনের নাড়ি-টেপা ডাক্তারি বটে।

ডাঃ মিস্ত্রীর আরও একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 'ডাক্তারির স্নাতক পর্যায়ের প্রশিক্ষণের প্রাক্কালে প্রথমেই এক প্রণম্য শিক্ষক বলেছিলেন এক আপ্তবাক্য— রোগীর কষ্টের বিবরণ শুনে ৮০ শতাংশ রোগ নির্ণয় করা যায়, বাকি ২০ শতাংশ শারীরিক পরীক্ষায়। তোমার মগজ তোমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। ল্যাবারেটরির পরীক্ষা তোমার রোগ অনুমানের নিশ্চয়তার জন্য।

ছোট ভাই হার্টের রোগী। বুকে ব্যথা নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কয়েকজন পরিচিত চিকিৎসকের সাহায্যে সে সেরে উঠল — (১) আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার— ডাঃ বাগচি। (২) আমার শ্যালক বাড়িতে পড়াশোনা করে হোমিওপ্যাথি শিখেছেন। (৩) তৃতীয়জন পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র অনুসারী য়োগ ব্যায়ামের ভাল প্রশিক্ষক। (৪) একজন ভাল কবিরাজ।

হোমিও, যোগব্যায়াম ও কবিরাজি বৈজ্ঞানিক অ্যালোপ্যাথির বাইরে বলে এদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে অবহেলা করিনি। দেখেছি এই চিকিৎসাতেও রোগী সুস্থ হতে পারে কোনও প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

প্রথমে আমার বন্ধু অ্যালোপ্যাথের নাড়ি-টেপা ডাক্তারির কিছু ঘটনার কথা জানাই। আমি গৌহাটি থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছি। আমার মেয়ের জন্ডিস হল। এক আত্মীয়ের পরামর্শে একজন ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে মেয়েকে দেখালাম। প্রেসক্রিপশন্ অনুযায়ী ওষুধ ও পথ্য চালু হল। কষ্ট কমে না। পায়ে ব্যথা। রাতে ঘুম নেই। খাওয়া-দাওয়া সব সেদ্ধ-সেদ্ধ। ভয় পেয়ে পরদিন ভোরবেলাতেই বন্ধু ডাক্তার ডাঃ বাগচির কাছে গিয়ে সব বললাম ও তাঁর পরামর্শ চাইলাম। বন্ধুটি একটি ট্যাবলেট দিল আর তার অর্ধেকটা খাইয়ে দিতে বলল। ওষুধ এনে মেয়েকে খাইয়ে দিলাম। মেয়ের পায়ের ব্যথা ও অস্বস্তি চলে গেল। মেয়ের অবস্থা একটু স্থিতিশীল হলেই ভাইয়ের দিকে নজর দিলাম। আবার বন্ধুটির পরামর্শ চাইলাম। তাঁর মতে ভাইয়ের হার্টের কোনও রোগ নেই। ওর রোগটা হল পেটের। দরকার পেটের চিকিৎসা। আমি সাহস পাচ্ছিলাম না হার্টের চিকিৎসা বন্ধ করে পেটের চিকিৎসা করা! আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বন্ধুটি আর জি কর-এর এক কার্ডিওলজিস্টকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। সঙ্গে এনেছেন পোর্টেবল্ ইসিজি মেশিন। ইসিজি পরীক্ষা হলে কার্ডিওলজিস্ট বললেন ওর হার্টের কোনই অসুখ নেই।

ভাইকে দেখছেন কলকাতার এক বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট। তিনি সরবিট্রেটের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছেন। তিনি ভাইকে বললেন, আপনি বাইপাস সার্জারির জন্য মনকে প্রস্তুত করুন। তখন আমিও ঠিক করলাম এই বিনা পয়সার কার্ডিওলজিস্টকে ছাড়তে হবে। ডাঃ বাগচিকে বললাম আমার ভাইয়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে। তিনি একটা শর্ত দিলেন। ভাইকে হার্টের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হবে। তা কি করে সম্ভব? আত্মীয়স্বজনদের কি বোঝাব? যে রোগী বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্টের দেওয়া হাইডোজের সরবিট্রেট খাচ্ছে, বাইপাস সার্জারির জন্য প্রস্তুত করছেন তাকে এক ধাক্কায় কি করে সরিয়ে আনতে পারি? বন্ধুকে বোঝালাম হঠাৎ করে এই পরিবর্তনে ও একটা মানসিক ধাক্কা পাবে। যদি সহ্য করতে না পারে তবে অন্যরকম বিপদ উপস্থিত হতে পারে। কথাটা বন্ধুটি সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারল না। বলল, ঠিক আছে, আমি আস্তে আস্তে ওষুধটা তুলে নেব। তখন ও নিজেই বুঝতে পারবে যে ওষুধটার আর প্রয়োজন নেই। আমার ভাই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগল। তারপর ৩০-৪০ বছর কেটে গেছে। অন্যান্য নানা রকম রোগে ভুগেছেন তবে হার্টের রোগের কথা আর ওঠে নি। বলা যেতে পারে নাড়ি-টেপা ডাক্তারির কাছে উচ্চ প্রযুক্তি হেরে গেল। আমার বন্ধুটি স্টেথোস্কোপে পালস্ বিট-এর স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক শব্দ শুনে এবং রোগীর কষ্টের বিবরণ শুনেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ নির্ণয় করে ফেলতেন।

আমার ঠোঁটের ওপর একটা ফুস্কুড়ি উঠল। কোনও জ্বালা যন্ত্রণা নেই। ডাঃ বাগচি বললেন এটাকে প্লাস্টিক সার্জারি করতে হবে। প্লাস্টিক সার্জারি? না জানি সেটা কিরকম হবে! আবার নতুন কোনও ফ্যাসাদ না হয়। হোমিওপ্যাথ এক চিকিৎসকের কাছে গেলাম। বইপত্র ঘেঁটে তিনি বললেন— এর হোমিওপ্যাথিক রেমেডি আছে। বাগচিকে বললেন আরও ২-৩ দিন অপেক্ষা কর। তিনি ওষুধ দিলেন অ্যাসিড নাইট্রিক (আই এম)। ২-৩ দিনের মধ্যে ফুস্কুড়ি মিলিয়ে গেল। সার্জারির দরকার হল না। এছাড়াও কিছু কিছু রোগের জন্য কিছু সামান্য ওষুধ খেয়েই উপকার পেয়েছি, যেমন — একোনাইট, আর্ণিকা, ব্রায়োনিয়া

ইত্যাদি। মাছের কাঁটা গলায় বিঁধলে সাইলেসিয়া খেতাম। একজন নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথ জানা থাকলে তাঁর সাহায্যে অনেক কষ্ট নিবারণ করা যেতে পারে। এটাকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলে অবজ্ঞা করাটা ঠিক হবে না।

এরপর আমার তৃতীয় চিকিৎসক যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষকের কথা বলি। ইনি ব্যায়ামের সময় হাত-পায়ের চালনার সঙ্গে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়াও সযত্নে শিখিয়ে দিতেন। তাঁর ব্যায়াম প্রক্রিয়ায় হাত-পায়ের প্রতিটি গ্রন্থি বিনা প্রতিরোধে চালনা যাচ্ছে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখতেন। ব্যায়াম শেষ হলে মনে হত আমার প্রতিটি শিরায় মুক্ত প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হত রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক ছন্দটা আমার রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার ইমিউনিটি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। রোজকার ব্যায়ামে এটাই সার সত্য বলে মনে হয়েছে।

কখনও কখনও বিশেষ কোনও অসুবিধে হলে তার জন্য বিশেষ যোগ ব্যায়ামের প্রয়োজন হত। যেমন একবার মনে হল আমার ঘন ঘন খিদে পাচ্ছে। ডাঃ বাগচি সেকথা শুনে রোগ নির্ণয় করে বললেন, আমার ডায়াবিটিস হয়েছে। গ্লুকোজ খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন সত্যিই রক্তে গ্লুকোজ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আমার মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করলেন। সঙ্গে সুগার কমানোর জন্য হাল্কা ওষুধ খেতে দিলেন। ফল হল বিপজ্জনক। রক্তে সুগার এত কমে যাওয়ার ফলে অন্য একজন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার উপদেশ দিলেন সুগার কমাবার ওষুধ বন্ধ করতে। সেই সঙ্গে মিষ্টি খাওয়াও শুরু করতে। আমি যোগ ব্যায়ামের শিক্ষককে জানাতে তিনি বললেন এর জন্য যোগ ব্যায়ামের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমি সেই ব্যায়াম শুরু করলাম। তারপর আর কখনও অসুবিধা হয় নি।

আমাদের শরীরের কাঠামোটা অনেকগুলো ছোট-বড় হাড় গ্রন্থির দ্বারা সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে। একজন যোগ-ব্যায়াম প্রশিক্ষক যখন ব্যায়াম অভ্যাস করান তখন এই ছোট-বড় প্রতিটি গ্রন্থিকে তিনি নাড়িয়ে দেখেন দেহের অঙ্গগুলি কোথাও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না। যদি বাধা হয় তখন তিনি সেটার প্রতি বিশেষ নজর দেন ও বাধাটিকে দূর করার চেষ্টা করেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য। কোনও গ্রন্থিতে চলন বাধাগ্রস্ত হলে গোড়াতেই তাকে সংশোধন করে দিতেন।

হাঁটুর ব্যথার কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য। আগে আমাদের মা-ঠাকুমাদের এত হাঁটুর ব্যথার কথা শোনা যেত না। গ্যাস ওভেন চালু হওয়ার পর থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। ওভেন ব্যবহারে গৃহিণীদের সুবিধা হয়েছে ঠিকই, তবে সব কিছুরই ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে। গ্যাস ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তবে হাঁটু ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগ ব্যায়াম শুরু করা ভাল।

এবার কবিরাজি চিকিৎসার কথা বলি। এই চিকিৎসাতে রোগ-জীবাণু নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন হয় না। এঁরা রোগ নির্ণয় করেন হার্ট বিটের অস্বাভাবিকতা দেখে। হার্ট বিট ধরা পড়ে নাড়ির স্পন্দনে। কবিরাজ রোগীর কষ্টের বিবরণ শুনে রোগের অনুমান করে নেন। তাঁরা মনে করেন বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহে সাম্যভাবে থাকলে কোনও রোগ হয় না। সেটা বোঝার চেষ্টা করেন নাড়ির স্পন্দনে গভীর মনোযোগ দিয়ে। ডা. মিস্ত্রীর ভাষায় এঁরা প্রকৃত নাড়ি-টেপা চিকিৎসক।

আমাদের বংশের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। বাবা যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বাবা তাঁর পূর্বপুরুষদের পেশা গ্রহণ করলেন। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকে একটি আয়ুর্বেদ শিক্ষার কলেজ আছে, সেই কলেজ থেকে 'বৈদ্যশাস্ত্রী' উপাধি নিয়ে পাশ করলেন। বাবার কাছেই শুনেছি, সেখানে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ক্লাস নিতেন।

ছোটবেলা থেকেই বাবাকে আমরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রূপে পেয়েছি। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন আমাদের কোনও আধুনিক চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় নি। আমরা দুই ভাই কবিরাজি শিখি নি, নাড়ি জ্ঞান হয় নি। বাবার কাজের সাহায্য করতে গিয়ে কিছু ওষুধ তৈরি করা শিখেছি। রোগীদের যে ওষুধের ব্যবস্থা করা হত সেটা খাতায় লিখে রেখেছি। বাবা প্রয়াত হবার পরও রোগের উপসর্গ দেখে নিজেদের চিকিৎসা চালিয়ে নিতে পারতাম। অবশ্য খুব প্রয়োজন হলে হোমিও বা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতাম।

দু-চারটে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার নমুনা পেশ করছি। বিচার করে দেখুন এটা অবৈজ্ঞানিক কিনা। ডাঃ বাগচির চিকিৎসায় আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। তিনি লিভারের অবস্থা দেখে বলেছিলেন লিভার অনেকটা ভাল থাকলেও সন্তোষজনক নয়, অন্য অসুখের চিকিৎসা করলেও লিভারের জন্য ওষুধ দিতেন। একবার আমার মনে হল বাবার কবিরাজির বইয়ে আয়ুর্বেদ সংগ্রহে লিভারের যে ওষুধ আছে সেটা খাওয়ালে কেমন হয়। ওষুধ তৈরির পদ্ধতি খাতায় লেখা ছিল সে অনুযায়ী আমার মেয়ের জন্য আমি নিজেই ওষুধটা তৈরি করলাম, মাসখানেকের জন্য সেটা ওকে খাওয়ালাম। একবার ডাঃ বাগচির মেয়ের অন্য কোনও অসুখের জন্য গেলে তিনি লিভার পরীক্ষা করে বললেন, লিভার খুব ভাল আছে।

একবার আমার ভাইয়ের মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। ডাক্তারবাবুরা নানারকম পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছেন, কিন্তু রোগের উপশম হচ্ছে না। যন্ত্রণা অসহ্য হলে ভাই বাবার ফটোর সামনে একদৃষ্টে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে তাঁর মনে

হল যেন স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন ভেঙে গেলে ভাইবউকে ডেকে বললেন— বাবা আমাকে ওষুধ বলে দিয়েছেন। তোমরা কফকেতু আদার রসে ভিজিয়ে একটা প্রলেপ তৈরি করে আমার কপালে লাগিয়ে দাও। শুকিয়ে গেলে আবার লাগাতে হবে— সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত। ওষুধটা লাগানোর কয়েকদিনের মধ্যে ভাই রোগমুক্ত হয়ে গেল। পরে ডাক্তারবাবুদের বললে, তাঁরা বিস্মিত হয়ে বললেন— আমরা তো নার্ভের চিকিৎসার পরিকল্পনা করেছিলাম।

খুব সাম্প্রতিক ঘটনা। ভাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। ফুসফুসে নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। কিন্তু তার কোনও চিকিৎসা করা হয় নি। কারণ রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে সব অ্যান্টিবায়োটিকই রেজিস্ট্যান্স। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার দুর্বলতা — রোগ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। হোমিও ও কবিরাজি চিকিৎসক উপসর্গ ও নাড়ি জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করেন।

বিবেক সেন

স্মারক বক্তৃতার লিখিত অংশ খুঁটিয়ে পড়ার জন্য পত্রলেখককে ধন্যবাদ। ওঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সম্মান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আমার জবাব দিচ্ছি।

(ক) এটা নির্মম সত্য হলেও, আমাদের দেশে প্রথাগত পদ্ধতির উপরে আপামর মানুষের ভরসার জায়গা নেই, কাউকে ধরতে হয়, ক্যাচ লাগাতে হয়। সভ্য দেশে এমন হওয়ার কথা নয়।

(খ) অবৈজ্ঞানিক আলোচনা এই পত্রিকা অনুমোদন করে না। আমিও করি না।।

(গ) অ্যান্টিবায়োটিক হাল্কা বা ভারী হয় না, যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) এমনটা হওয়ার কথা নয়। বাস্তব এই যে, 'জনপ্রিয় এলিট' বেসরকারি ডাক্তারের জন্য একটা বাজারি চাহিদা নির্মাণ করা থাকে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

(ঙ) সরবিট্রেট হার্টের রোগের একটি ওষুধ বটে, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ। রোগী অথবা রোগীর আত্মীয় পরিজনদের এই জটিল রোগের চিকিৎসায় বিশেষ একটি ওষুধের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকার বোঝা অসম্ভব। প্রথমে চিকিৎসক বেছে নিতে হয়, তারপর নিঃশর্তভাবে তাঁর ওপরে নির্ভর করতে হয়।

(চ) হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণ নেই, তাই আস্থা নেই। হোমিও, যোগব্যায়াম ও কবিরাজি বৈজ্ঞানিক অ্যালোপ্যাথির বাইরে বলে এদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে অবহেলা করি নি। এই পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা 'হোমিওপ্যাথি' নিয়ে। যাতে ওই চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে লেখকরা প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতিষ্ঠিত হোমিও চিকিৎসকদের উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

(ছ) শ্রদ্ধা আর যুক্তিনির্ভর ভরসার মধ্যে একটা স্থূল পার্থক্য আছে। রোগের চিকিৎসা একটা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি— সেখানে শ্রদ্ধা বা অন্ধ আত্মসমর্পণের স্থান নেই।

(জ) যোগ ব্যায়াম এক শ্রেণীর খালি হাতের ব্যায়াম—অস্থিসন্ধি সচল রাখে, পেশি নমনীয় রাখে। আলাদা কোনও প্রাপ্তি আশা করতে নেই।

(ঝ) সব সময়ে প্রত্যেকটা হৃদস্পন্দন কব্জির নাড়িতে পৌঁছায় না— যেমন এট্রিয়াল ফিব্রিলেসন রোগ। কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতিতেও প্রচলিত যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রমাণের অভাব আছে। আধুনিক পৃথিবার নিয়মে যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি (যেটাকে অনেকে অ্যালোপ্যাথি বলেন) ছাড়া অন্য উপায় নেই।

(ঞ) আসলে আমি নাড়ি টেপা ডাক্তারি বলতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির 'ক্লিনিক্যাল মেডিসিন' বা ভাষান্তরে রোগের লক্ষণের বিবরণের বিশ্লেষণ, শারীরিক পরীক্ষায় তার সমর্থন নিয়ে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগ ও তার পরে উপযুক্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগের পুনর্মূল্যায়ন করে রোগ নিরাময় অথবা রোগ নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে চেয়েছি। কোনও অবৈজ্ঞানিক দাবি করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই।

(ট) এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বা প্রমাণ নেই।

(ঠ) একে অনেকে 'anecdote' বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেন। আমিও বলি। এতে কিছু প্রমাণ হয় না। — **ডাঃ গৌতম মিস্ত্রী**

(২)

প্রিয় সম্পাদক,

উৎস মানুষ পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যা ডাকে পেলাম। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'আমার দেখা অমলেন্দুদা' লেখাটা পড়ে খুব ভালো লাগল। ওনার সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। তবে শেষ অনুচ্ছেদে লেখক জানিয়েছেন 'বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকার নির্ধারিত পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয় নি।' এটা হয়ত সঠিক তথ্য নয়। ভারত সরকার ওনাকে NCSTC জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেন ১৯৯৫ সালে। এছাড়া উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কারেও সম্মানিত হন ২০০১ সালে।

নমস্কারান্তে

অনুপ কুমার দাস, নতুন দিল্লি।

তথ্যসূত্র : Tyagi, B.K & Saha, Ayan Kumar (2020), Prof. Amalendu Bandyopadhyay: The man who brought the stars closer to common people. Dream 2047, September 2020. https//vigyanprasar.gov.in/wp-content/uploads/dream-sep-2020-engg.pdf

(৩)

সম্পাদক সমীপেষু,

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যায় অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর লেখা দু'টি পড়ে ওঁর সম্বন্ধে দু'একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত তথ্য যোগ করার প্রবল ইচ্ছে সামলাতে পারলাম না।

ভারতের আবহাওয়া বিভাগে আমরা ছিলাম বহুদিনের সহকর্মী। খুবই নিম্নস্তরের বিজ্ঞান কর্মী হিসেবে যোগ দিতে বাধ্য হয়ে তিনি নিজের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার স্বীকৃতি হিসেবে যোগ্যস্তরে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন। স্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কলকাতার আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবহাওয়া বিভাগের একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কৃতিত্ব তাঁরই। এই বিভাগের ওপর ভারতের জাতীয় বর্ষপঞ্জী (রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ) ও নৌ পত্রিকা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত। গত শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে আমাদের দুজনেরই কর্মস্থল ছিল আগরতলা বিমানবন্দর। অতি অল্পসংখ্যক কর্মচারির পরিবার নিয়ে বসতিটি তখন ছোট। তাই প্রায় প্রতি সন্ধ্যেতেই কাজের শেষে আমরা কয়েকজন সপরিবারে একত্র হতাম। যাঁদের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরা জানেন কত সুখকর ছিল তাঁর সঙ্গ। তার ওপর তাঁর ছিল প্রবল রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রীতি। তিনি নিজেও ছিলেন খুব সুগায়ক। অনুরোধে গাইতে তিনি দ্বিধা করতেন না। কত সন্ধ্যা যে তাঁর গানে আনন্দময় হয়ে উঠত? আমি আর আমার স্ত্রী প্রায়ই সে সুখস্মৃতি রোমন্থন করেছি।

আমার যে সুযোগ হয় নি, তবে যাঁরা তাঁর কলকাতার আবাসে গিয়েছেন তাঁদের কাছে শুনেছি তাঁর একমাত্র বিলাসিতা ছিল একটা দামি সঙ্গীত যন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) আর তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা। প্রচণ্ড মধুমেহ রোগ ছিল তাঁর। খাওয়াদাওয়ার প্রখর সংযম মেনে চলতে হত। ওই নিয়ে তিনি দেশে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। আমি ওঁকে কোনোদিন চিনি ছাড়া চা আর মুড়ি ব্যতীত আর কিছু দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারি নি। ৯০ ছুঁই ছুঁই মানুষটি অত কর্মশক্তি কোথায় পেতেন সেটা একটা বিস্ময়!

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

(৪)

প্রিয় সম্পাদক,

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০-তে উৎস মানুষের চল্লিশ বছর নিয়ে আমার স্মৃতিচারণের কয়েকটি অংশ সংশোধন ও পরিমার্জন করার অনুরোধ করছি। (১) ৫ পাতায় 'হাঁচি-টিকটিকি বাধা যে মানে সে গাধা' এটি মূল লেখা থেকে বাদ যাবে। (২) ৫ জানুয়ারি ২০০৪ হরিণঘাটার উত্তর রাজাপুরের ডাক্তার সুশীল রায়ের (৫৪) দেহদান আশপাশের বেশ কিছু এলাকার মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীতে নারায়ণপুরের ইন্দুপ্রভা ভৌমিক (৭৫), বড়জাগুলির প্রদোষ পাল (৭৩) ও বিমল দে-র (৭৫) দেহদান করা হয়। (৩) ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রথম গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে উৎস মানুষ সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপস্থিতি এবং অনুষ্ঠান শেষে তাঁর বক্তব্য আজও কানে ভেসে আসে।

উৎস মানুষ বেঁচে থাকুক। শুভেচ্ছাসহ

সতীশচন্দ্র মণ্ডল

পুস্তক সমালোচনা

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

নাম : গ্যালিলিও থেকে হকিং : সৃষ্টির আদি থেকে অন্তে

লেখক : চন্দনসুরভি দাস

প্রকাশক কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা,
কলকাতা-৩২

প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০১৯

(সংযোজিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ) মূল্য ১৫০ টাকা

বইটার নামে পাঠকের মনে একটা সংশয় তৈরি হয়— সত্যি কি সৃষ্টির আদি বা অন্ত আমরা জানতে পেরেছি? শ্রী দাস 'শেষের কথা'-তেই তার উত্তর দিয়েছেন— ''না...আদি নেই, অন্ত নেই।'' বিগ ব্যাং তত্ত্ব, মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে একটি চালু তত্ত্ব। এখন অব্দি পাওয়া বিভিন্ন তথ্য বিগ ব্যাং তত্ত্বকে বেশ কিছুটা সমর্থন করে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে তা আমরা কেউই জানি না। আর গ্যালিলিওর আগে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ হয়েছিল— পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বের ভাবনাকে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বে পরিবর্তিত করা— যেটা চন্দনবাবু প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

বইয়ের প্রধান গুণ— খুব সহজ ভাষায় ভীষণ কঠিন একটা বিষয় পাঠকের কাছে পরিবেশন করা। অনেক পরস্পরবিরোধী বিষয়কে সাধারণভাবে উপস্থাপনা করে পুরো বইটা পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখার যে মুন্সিয়ানা তিনি দেখিয়েছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। বিজ্ঞান সচেতনতা আমাদের দেশে এমনিতেই কম। হাতে গোনা এই ধরনের কিছু বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষ বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝে যেভাবে কাজ করে চলেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। পাঠকদের বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ তৈরি করা যে কোনও বইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চন্দনবাবুর লেখা পাঠকদের মহাবিশ্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বাড়াতে সাহায্য করবে বলেই আমার ধারণা।

উমা